এসে গেল আলোর উৎসব দীপাবলি, আর কয়েক দিন বাকী। কিন্তু এই আলোক উৎসব কি শুধুমাত্র বাইরের দুনিয়াকে আলোকিত করার জন্য নাকি অন্তরের অন্ধকারকে দূরীভূত করার তরে? কালী পূজায় কারণ পান আজকালকার এক রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কজন জানেন তন্ত্র সাধনায় 'মদ' শব্দটির অর্থ 'গর্ব'? এই কারণ সুধায় অবগাহন করে যুগে যুগে অনেক মানুষ নিজের, পরিবারের এবং সমাজের অকল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়েছেন। আমরা কি এই ভ্রম সংশোধনের প্রয়াস নিতে পারিনা!

গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ১, সংখ্যা ৫

অক্টোবার ২০১৯

দীপাবলি সংখ্যা

কলম হাতে

প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য, নাহার আলম, ডাঃ অমিত চৌধুরী, দীপঙ্কর সরকার, অমিত নাগ, পিয়ালী চ্যাটার্জী মল্লিক এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

আজ পাণ্ডুলিপির ছোটো পরিবার আর আগের মতো ছোটো নেই। আমরা অনেক নতুন লেখক-লেখিকা এবং পাঠক-পাঠিকাকে পাশে পেয়েছি। বেশ কিছু নতুন ধরণের লেখার রসাস্বাদনের সুযোগও এসেছে। তবে লেখার মান উন্নয়নের জন্য শুধু কি লেখা আর পড়া? চাই তার সাথে ক্ষুরধার সমালোচনা। তাই প্রত্যেক লেখারই গুণমান উৎকৃষ্ট করা অত্যন্ত আবশ্যক।

পাণ্ডুলিপির জন্মদিন এবং বাংলা পাণ্ডুলিপির স্রষ্টা ও বাংলা সাহিত্যের দিকপাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের দুই শত বৎসর উদযাপন উপলক্ষ্যে, আমরা পেয়েছি কিছু স্রষ্টার সৃষ্টির উপাদান। এছাড়া পাণ্ডুলিপি গ্রুপ থেকে প্রকাশিত 'গুঞ্জন' ই-পত্রিকা (ম্যাগাজিন) আজ পৌঁছে গেছে বিশ্বের দরবারে।

আরেকটি আনন্দ সংবাদ হল, ইতিমধ্যে পাণ্ডুলিপির পক্ষ থেকে প্রথম ছোটোদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে 'ভূ ভূ ভূ ভূ ভূউত' নামক ভৌতিক গল্পের বইটি। অনেক কচিকাচাদের কাছে গল্পগুলি বেশ ভিন্ন স্বাদের বলে মনে হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই খোলা বাজারেও বইটি উপলব্ধ হবে। বহু পূর্বেই, অন্যান্য নির্বাচিত লেখকদের সাথে আরও কিছু প্রকল্পের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল, তারও কাজ চলছে। ■

বিনীতা

রাজশ্রী দত্ত – সম্পাদিকা

শরণ্যা মুখোপাধ্যায় – সহ-সম্পাদিকা



ওঁ ক্রীং ক্রীং হূং হূং হিং হিং দক্ষিণে কালীকে ক্রীং ক্রীং
ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং হ্রীং স্বহা।
ওঁ কালী কালী মহাকালী কালীকে পাপহারিণী
ধর্মার্থমোক্ষদে দেবী নারায়ণী নমোস্তুতে।

পাণ্ডুলিপির তরফ থেকে সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং পৃষ্ঠপোষকগণকে জানাই দীপাবলির আন্তরিক শুভ কামনা...

Image Courtesy:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kali;_standing_triumphantly_over_Shiva._Chromolitho_Wellcome_V0045066.jpg
Source:
https://wellcomecollection.org/works?wellcomeImagesUrl=/indexplus/obf_images/ba/23/1aa7719453393583 59de087d3a8d.jpg

কলম হাতে




কলম হাতে

কালে কালে কালী

রাজশ্রী দত্ত

“অসতো মা সদগময় তমসো মা জ্যোতির্ময়...”

সকল আঁধার হরণকারী, দীপের আলোর ন্যায় দীপ্তি প্রদানকারী করালবদনা, কৃষ্ণবর্ণা ও নীলাম্বরী দেবী হলেন মা কালী। দীপাবলি বা দীপান্বিতা অথবা আশ্বিন অমাবস্যা তিথিতে দক্ষিণা কালী রূপে পূজিতা হন আরাধ্যা দেবী কালী। এই দীপান্বিতা উৎসব যদি মোহনা হয়, তবে তার উৎস-কাহিনীর ব্যাপ্তি বহুদূর। অতএব এর উৎস অনুসন্ধানের পথ সহজসাধ্য নয়। কালের অমোঘ গতিতে নানান উপগাথা এসে একাত্ম্য হয়ে গিয়েছে। যা মূল কাহিনী থেকে পৃথক করা প্রায় অসম্ভব। তবে প্রতিটি তথ্যই চিত্তাকর্ষক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈদিক সাহিত্যে অথর্ব বেদেই প্রথম কালীর স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এছাড়া মার্কণ্ডেয় পুরাণে, কালিকা পুরাণেও মা কালীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বে কালরাত্রি নাম্নী এক দেবীর কথা ব্যক্ত হয়েছে, যা কালিকার এক ভিন্ন স্বরূপ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে প্রথম পর্যায় দেবী কালী অনার্য গোষ্ঠীর দ্বারাই পূজিতা হতেন। হরপ্পা-মহেঞ্জদারোতে যে অবয়বের

মাতৃরূপে বন্দনা হত, তার দেবী কালিকার মূর্তির সাথে অনেকাংশে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

সপ্তম থেকে দশম শতকে সমকালীন কবি বাকপতি বিরচিত "গৌর বহও" নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থে শবর গোষ্ঠীর দ্বারা পূজিতা এক মুণ্ডমালিনী, ভয়ালদর্শনা দেবীর বর্ণনা করা হয়েছে, যা কালিকার রূপের সমতুল্য। খ্রিস্ট পূর্ব ৩০০ থেকে প্রায় ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালী যুদ্ধের দেবী হিসাবে পূজিতা হতেন।



২০১৬ সালে পূজিতা মা কালীর মূর্তি, ডোমজুর, হাওড়া...

ফটোঃ নরেন মারিক ঁ

সতেরোশো খ্রিস্টাব্দ উত্তর সময়ে কালী সাধনা অন্য রূপ লাভ করে। ভয়ালদর্শী দেবী স্নেহময়ী মাতৃস্বরূপা হয়ে ওঠেন। সাধক রামপ্রসাদের সুরে প্রতিভাত হয় – **"ওরে কালীপদে কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি।।"**

এরপর শ্রী কমলাকান্ত, সাধক বামাক্ষ্যাপা এবং শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ন্যায় কালী উপাসকদের কাছে দেবী কালিকা ভবতারিণী রূপেই পূজিতা হন। স্বামীজিও তাঁর 'Kali the Mother' কবিতায় অতি সুন্দর ভাবে মা কালীর ভাবরূপ বর্ণনা করেছেন। বাঙালী হৃদয়ে মা কালীর করুনাঘন অবস্থান চিরতরে।

ঁ Image Courtesy:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kali_Puja_at_Domjur,_2016.jpg ■

বন্দিনী

অনির্বাণ বিশ্বাস

শরীরের অজস্র ভালোবাসার চিহ্নগুলো
যখন ক্ষত হয়ে ওঠে,
রাতের গোপন শীৎকার পরিণত হয় গোঙানিতে,
কিংবা লজ্জার আরক্ত মুখে ফুটে ওঠে
সারা রাতের পদপিষ্ট-ক্লিষ্ট-দোমরানো-মোচরানো ফুলের
নিঙড়ানোর ছাপ, সেই সময়েই
শ্বাশুড়ীর কথার শরে বিদ্ধ আগমনী গানে,
রক্তিম প্রভাতী ভোরের সূচনা হয় –
আজকের উমার।

ঈশ্বরের পবিত্র দূত হয়ে আসা শিশুর জন্ম-রহস্য পরমাত্মার
কৃপার উপর নির্ভরশীল...
এ সত্য শ্বাশুড়ীরূপী ভয়ঙ্করী নারীশক্তির কদর্য রূপ অবগত
হয়েও, ফুটফুটে শিশুরও ভাগ্য নির্ধারণ করেন —
লিঙ্গ নির্ধারণের মাধ্যমে।

প্রতিদিন সমাজের অসংখ্য শকুনের চোখ, তাদের লকলকে
কামাতুর লোভনীয় হাতছানির মাকড়সার জাল ছিঁড়ে
আসে আজকের উমা।

সুপ্তা

সেই তো প্রকৃত আদ্যাশক্তি মহামায়া...
যে শক্তি কখনো
মাতৃরূপা — সন্তানের জননী, অজস্র বঞ্চনা সত্ত্বেও সহধর্মিনী।
সমাজের শকুনিদের মাঝেও পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী গঙ্গা।
সেই তো কখনো সংসারে লক্ষ্মী — অভাবে কর্মজীবী
অন্নপূর্ণা...

মায়ের স্নেহের উমা — সামাজিক কীটের সম্মুখে করালবদনী
মহা কালী...
সন্তান জননী মা ষষ্ঠী — তিনিই আবার বিপদে চণ্ডী...
কখনো বরাভয়দাত্রী সংসারে জগদ্ধাত্রী।
সেই তো সর্বংসহা — শক্তিময়ী...

সর্বদা সম্মুখে বিরাজিতা — অথচ সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিতা...
অন্তরে শক্তির আকড় অথচ কোমল স্বভাবশীলা।
অসীম সহ্যশক্তিরূপিণী — অপমানেও সহাস্য বদনী...
মহাশক্তি স্বরূপিণী আদি শক্তি।

তিনিই তো আসল জগজ্জননী,
মহামায়া মা দুর্গা...
আপনি মায়ায় সদা লুক্কায়িত ভৈরবী — স্বেচ্ছায় মর্ত্যবাসিনী —
অপরূপা বিবিধ কায়ায়... চির-বন্দিনী। ■

আকাশ প্রদীপ জ্বলে

অমিত নাগ (আমেরিকা)

মাত্র একটা মাস। আর তার মধ্যেই হুড়মুড়িয়ে কত কি যে ঘটে গেল! আনন্দ হুল্লোড় শুরু হয়েছিল সেই পুজোর ছুটি পড়া থেকে। তারপর একে একে মহালয়া, দুর্গাপূজো, দেশের বাড়ির পুরোনো ঘরোয়া পুজো, কলকাতার পুজো, নতুন জামা, মাঝরাত অবধি প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ধাক্কাধাক্কি করে ঠাকুর দেখা, বিজয়ার মিষ্টি, লক্ষ্মীপুজোর নারকোল নাড়ু, খিচুড়ি ভোগ খাওয়া এলোও যেমন আবার চলেও গেল। মন খারাপ ভাবটা চাঙ্গা করতে এসেছিলো কালীপুজো, বাজি পোড়ানো, ভাই ফোঁটার জমিয়ে খাওয়া, কিন্তু তারপর সত্যি সত্যি সব শেষ হয়ে এল এক সময়। এবার স্কুল খোলার পালা। আর খুললেই পরীক্ষা। কিছুই যেন ভাল লাগে না আর।

উৎসব উৎসব ভাবটা টেনে বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল খানিক। কালীপুজোর পর, ভোরবেলা হিমে ভেজা, না-ফাটা, আধ-পোড়া বাজিগুলো কুড়িয়ে এনে বারুদ বার করে রোদ্দুরে শুকিয়ে, সন্ধ্যেবেলা কাগজে ঢেলে ভুস করে জ্বালিয়ে, দু’ চারটে জমিয়ে রাখা সাপবাজি অন্ধকার নামলে উঠোনে জ্বালিয়েও, কালীপুজোর বাজি পোড়ানো পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। এ যেন বিসর্জন না দিতে পারা

আবেগপ্লুত

বটতলায় ফেলে রেখে যাওয়া ঠাকুরের মূর্তির গলায় সস্তার প্লাস্টিকের ফুলের মালা পড়িয়ে পুজো পুজো ভাব আনার করুণ চেষ্টা।

ছাদের আলসে বরাবর লাগানো টুনি বাল্বের চেন লাইট – বাড়ির বড়োদের ধরে, চার পাশের সব বাড়ির খুলে নেওয়ার পরেও দিন দুয়েক বেশি জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। এবার সেটাও খুলে নিতে হয়েছে। বাতাসে খানিক হিমেল কামড় বোধ হয় এখন। ভোরে পুকুরের জলে সর পড়ে, হালকা ভাপের মতো ধোঁয়া ওঠে। সন্ধ্যে নেমে আসে আগের থেকে তাড়াতাড়ি।

আমাদের সাধারণ পাড়াটা উৎসবের মরসুমে আলোয় আলোয় যে অসাধারণ রূপে সেজে উঠেছিল, সে সাজ হারিয়ে আবার অন্ধকারে ডুব দিয়েছে আগের মতো। এই সদ্য সন্ধ্যায়, যখন গভীর রাত নেমে আসেনি, হাওয়ার হিমেল ভাব থেকে বাঁচতে বাড়িগুলো জানলা অর্ধেক বা পুরো বন্ধ করে রাখছে বলে বাইরেটা আরো বেশি অন্ধকার দেখায়। সন্ধ্যেবেলাতেই যেন গভীর রাত নেমে আসে এ পাড়ায়। ভূতচতুর্দশী হয়ে গেছে কদিন আগে। জানলা দিয়ে দেখা যায় প্রতিবেশীদের বাড়ির পর বাড়ি চিলেকোঠার ঘরের মাথায় বাঁশের মাথায় টাঙানো আকাশপ্রদীপ জ্বলছে ওপরের দিকে মুখ উঁচু করে। লাল নীল সবুজ বেগনি রঙের আকাশপ্রদীপ সার দিয়ে আকাশপানে কাদের যেন আলো দেখাচ্ছে - নীল রংই বেশি।

আবেগপ্লুত

টিউশন থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যে নেমে এসেছিল ধীরে ধীরে। শীত শীত ভাবটাও অনুভব করা যাচ্ছিল। রেললাইনের ধারের বস্তির ছেলেরা ছেঁড়া কাঠকুঠো, টায়ার জ্বালানোয় বাতাসে পোড়া পোড়া কটু গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। ধোঁয়াশার মতো ভাব, সব কিছু কেমন ঝাপসা, আবছা দেখায়। ঠান্ডা লাগার ভয়ে অথবা ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধ থেকে বাঁচতে বেশির ভাগ প্রতিবেশী বাড়ির জানলা বন্ধ অথবা ভেজানো। সেই আধভেজানো জানলার ফাঁক গোলে রেডিওর গান চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে ভলিউমের তেজ হারিয়ে – "বড় একা লাগে, এই আঁধারে...," চৌরঙ্গী সিনেমার গান। স্যাটা বোস গ্র্যান্ড হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে, ময়দানে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আধো অন্ধকার শহরের দিকে তাকিয়ে একাকী মগ্ন আত্মচিন্তায়...

দূরে বাজারের দিকে কোথাও বুঝি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিচ্ছে কেউ। মাইকে ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছে তার। এমন বক্তৃতার আয়োজন প্রায় সন্ধ্যেবেলায়ই হয়। লোকজন যে বিশেষ হয় তাও নয়। তবু তক্তপোশের ওপর মাইক লাগিয়ে, পেছনে লাল শালু আর আশেপাশে দু'চারটে লাল পতাকা টাঙিয়ে চটজলদি তৈরী মঞ্চে বক্তৃতা দেয় স্থানীয় নেতারা, বিভিন্ন বিষয়ে – কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা, নেমে আসা মূল্যবৃদ্ধির খাঁড়া, স্থানীয় জুটমিল আর কাঁচকলের লক আউটের প্রতিবাদে, অথবা আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী

আবেগপ্লুত

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। বাতাসের দিক পরিবর্তনে সেই আওয়াজ মাঝে মাঝে ক্ষীণ হয়ে আসে। দূরে রেললাইন থেকে ভেসে আসে একটানা হর্ন বাজিয়ে চলে যাওয়া মেলট্রেনের আওয়াজ। সন্ধ্যেবেলা রেলগেটের সামনে বাজার বসে – তরিতরকারি মাছের বাজার, তেলেভাজার ঝুপড়ি, মিষ্টির দোকান, মনোহারি দোকানের ভীড় আর লেভেল ক্রসিং এর সামনে জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকা সাইকেল রিকশা আর মানুষের ভীড়কে সাবধান করতে করতে ট্রেন চলে যায়। আমি বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে তার ক্ষীণ আওয়াজের বদলে যাওয়া তীক্ষ্ণতা শুনতে শুনতে ফিজিক্সের মাস্টারমশাইয়ের পড়ানো কথাগুলো ভাবতে থাকি - ডপলার্স এফেক্ট।

এমন সন্ধ্যায় সত্যি বড় একা লাগে। সবাই যে কোথায় চলে গেছে কে জানে! ঘরের আলোও কেমন টিম টিমে মনে হয়। রেডিওতে পরের গান লতা মঙ্গেশকরের "আকাশ প্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে। আমার নয়ন দু'টি শুধুই তোমারে চাহে, ব্যাথার বাদলে যায় ছেয়ে।" বাড়ি বাড়ি আকাশপ্রদীপ দেওয়া হয়েছে প্রিয় পরিচিত কাউকে বা অনেককে মনে করে। আলো দেখানো হচ্ছে তাদের। স্বর্গ বা মহাকাশের তারার ভীড়ে যেখানেই থাকুক না কেন, নিজের প্রিয়জনের বাড়িটুকু চিনতে যেন ভুল না হয়। মৃত্যুতেই সব সম্পর্কের শেষ নয়। বেঁচে থাকার বছরগুলিতে বহুদিন ধরে

আবেগপ্লুত

যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার স্মৃতিচারণের চেষ্টা আকাশপ্রদীপ দিয়ে সংযোগ গড়ার এই প্রচেষ্টায়। অনেক মানুষের বিশ্বাস তারা আজ আছেন অন্য কোনো জগতে অন্য কোনো রূপে।

আমার বিশ্বাস হয় না এসব চিন্তাধারায়। বিজ্ঞান বলে মানুষ প্রকৃতির খেয়ালে গড়ে ওঠা একটা কেমিক্যাল রোবট ছাড়া আর কিছু নয়। তার আমিত্ব, আত্মবোধ নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে তৈরী একটা আত্মপরিচয় মাত্র যা বেঁচে থাকাকালীন সময়ে বিরূপ পরিবেশে টিকে থাকার জন্য জরুরি। সেই একই কারণে, প্রকৃতি মানুষকে অন্যান্য জীবের মতোই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ও দিয়েছে।

আমিত্ব না থাকলে, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বোধ না থাকলে মানুষ নামক রোবট মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, আগুন, জল, ঝড় এই সব প্রাকৃতিক তান্ডব বা হিংস্র পশু অথবা শত্রুর আক্রমণে। তাই মৃত্যুতেই জীবের শেষ। আত্মা বলে কিছু হয় না।

মৃত্যুর পরে তার আর কোনো অস্তিত্ব নেই একথা অনেক মানুষই মেনে নিতে পারে না। আমার পরেও এ জগতের কর্মকান্ড আপন খেয়ালে চলতে থাকবে। সব কিছু এবং সবাই আগের মতোই থাকবে শুধু আমি থাকব না। "আমি নেই, আমি নেই, ভাবতেই ব্যাথায় ব্যাথায় মন ভরে যায়।" সেই না থাকা অস্তিত্বের বেদনায় কাতর হয়ে মানুষ কল্পনা

করে নিয়েছে আত্মার অস্তিত্বের কথা – যা শরীর থেকে থেকে শরীরে ঘুরে ঘুরে অমর হয়ে থাকে অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়ে মুক্ত হয়। কিছু মানুষের মন গড়া এই একটা মডেল অনেক মানুষকে চিরতরে হারিয়ে যাবার বেদনা থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে তাদের জীবৎকালে। ঠিক তেমনি দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা ও লড়াই এর মধ্যেও বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা খুঁজতে মানুষ ভগবানের মতো আরেকটা মডেল গড়ে নিয়েছে। পিতামাতা গুরুজনের মতো কল্পনার সেই অভিভাবকের ছত্রছায়ায় তাঁর আশীর্বাদে জীবনটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি খোঁজে সে। কোনো প্রমান নেই, শুধু একটা মনগড়া বিশ্বাসে ভর করে জীবন চালানোর শক্তি খোঁজে মানুষ। অনেকের ক্ষেত্রে সেই বিশ্বাস শক্তি যোগায় প্রাণে।

অথচ বিপুলা এই বিশ্বপ্রকৃতিতে মানুষের সৃষ্টি প্রকৃতির এক আকস্মিক খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই ব্যক্তি মানুষের থাকা না থাকায় প্রকৃতির কিছুই যায় আসে না। ব্যক্তিমানুষ এই বিরাট মহাবিশ্বে সামান্য ধূলিকণার থেকেও নগণ্য। তার জীবনের ব্যাপ্তি মহাকালের সময় সারণীতে চোখের পলক পড়ার থেকেও ক্ষণস্থায়ী। ব্যক্তিমানুষের জীবনাবসনে প্রকৃতি তাই কাঁদতে বসে না বা হাহুতাশ করে না। মানুষ বেঁচে থাকে তার উত্তরসূরিদের মধ্যে। সেটাই প্রকৃতির তৈরী অমরত্বের ব্যবস্থা। তাই এমন অনেক মানুষই

আবেগপ্লুত

আছে যারা এধরণের মতে বিশ্বাস করে থাকে এবং আত্মা বা ভগবানে না বিশ্বাস করেও দিব্বি আনন্দে কাটিয়ে দেয় একটা জীবন। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর অনেক মানুষই সেই দলের মধ্যে পড়ে।

তবু আকাশ ভরা তারার দিকে মুখ উঁচিয়ে তাকিয়ে থাকা টিমটিম করে জ্বলতে থাকা একরত্তি আকাশপ্রদীপ গুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভালো লাগে – ওরা নিজের নিজের বাড়ির হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনদের আলো দেখিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। যদি নজর কাড়তে পারে তারার ভিড়ে হারিয়ে থাকা সেই সব প্রিয় মানুষদের, তবে তাদের বাড়ি চিনে ফিরতে যেন ভুল না হয়।

কতজন বসে আছে বাড়িতে একবার, শুধু আরেকটিবার তাদের হারানো প্রিয় মানুষটিকে দেখার জন্য। রেডিওর গানের শেষ লাইনটা এবার যেন একটু জোরেই পাশের বাড়ির জানলা পেরিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। "আকাশপ্রদীপ জলে, দূরের তারার পান চেয়ে..." শিরশিরে হিমের হাওয়ায় গা বাঁচাতে চাদরটা ভালো করে শরীরে জড়িয়ে নিয়ে, আকাশপ্রদীপের দিকে চেয়ে থাকি।

দৃষ্টি বাঁশের মাথায় লাগানো লাল নীল সবুজ বাতিগুলো পেরিয়ে মহাকাশের সুদূর প্রান্তরে মিটমিট করে জ্বলতে থাকা তারাগুলো ছুঁয়ে আরও গভীরে এগিয়ে যায়, মহাকাশের কালো গহীন গহ্বরে। ■

আরবান মধ্যবিত্ত বা প্রগতির সূচক

অর্ঘ্য দত্ত

ছন্দ বানানোর বৃথা প্রচেষ্টায় –
হারিয়ে ফেলছি রোজকার সিমেন্ট বালি স্টোনচিপ।
লাল ইঁটেদের জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখছি,
শুকিয়ে ফাটল ধরছে রোজ।
পলেস্তারা করার ভারা, আসছি আসব করে
কাটিয়ে দিচ্ছে
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

তবু ছন্দ গাঁথছি, খুব মন দিয়ে।
রোজকার স্বপ্নেরা চোখের এক ইঞ্চি নীচে
ওলনের সুতোর রোঁয়ায় নেচে বেড়ায়।
জোরে জোরে প্রশ্বাসে ঘ্রান আসে
না হওয়া কিচেন থেকে।
বুঁদ হয়ে থাকি।

সিমেন্টে ড্যাম্প আর আশার বাথরুমে, বাথটবে সুখস্নান –
ফ্যানা ছলকে পড়ে, বুদবুদে বুঁদ হয়ে থাকি।
টিভিতে বিজ্ঞাপনের ফাঁকে
একটু একটু ঠোঁসা সিরিয়ালে
কে জানে কেন, সব প্লট এক লাগে;

পর্যবেক্ষণ

আর সূচকে তীরের ফলা
যেন প্যারাবোলিক পথ অতিক্রমের মুখে
ফালা ফালা করে দেয় সিমেন্টের বস্তাগুলোকে।

ওলন দুলছে, স্বপ্নেরাও।
রাস্তায় স্টোনচিপ পড়ে।
আলকাতরার একটার পর একটা পরত বাড়ে,
লেভেল বেড়ে বাড়ির সাঁকোর সাথে কোলাকুলি করে,
মাটির সাথে যোগাযোগ থাকে না।

ব্রেকিং নিউজের ভেতরের সত্যি জানবার জন্য,
খোয়াবের শক্ত খোয়ার জমাট কংক্রীটে ড্রয়িংরুমে
টেবিল চাপড়ে, সোফার হেলানে, বন্ধুদের তালেবর বিতর্ক –
ট্রেতে চা আসে, মল্লিকের দোকানে।

বালির ওপর শুলে তারা গোনা যায়।
পাটীগণিতে ভুল হয়।
এভাবে গুনতে গুনতে আর ভুল হতে হতে
আছন্ন পর্দায় আবিষ্কার করে ফেলা যায়
বেডরুমের আরাম বিছানা।
চোখ খুলে দাসখত লিখতে থাকি
মুদির দোকান থেকে দপ্তরখানা সর্বত্র।
সূত্র।
বাকি আছে করা অনেক আবিষ্কার,

পর্যবেক্ষণ

আমার জন্য রাখা ভারা বুঝি অন্য কোথাও ভাড়া খাটাচ্ছে
আমার সরকার।

তাও রোজ ফাটতে থাকা লাল ইঁটেদের জল দিতে হবে,
জানি মাটি থেকে ভাটা হয়ে এসে, ক্ষইতে ক্ষইতে আবার
মাটি হয়ে যাবে।
কিন্তু দুলতে থাকা ওলনের অস্থিরতা যদি এক মগ জল
দিয়ে স্থির হয়,
নিশ্চয়
আবার নতুন প্যারাবোলার জন্য কেউ টেনেছে জ্যা।
তদ্দিন না হয় সব ভাড়া খাটুক;
আর স্বপ্নরা ব্যালেন্স করুক
সুতোর রোঁয়ায়। ■

লেখকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

১) ‘গুঞ্জন’ এর জন্য আপনার লেখা (MS Words এবং PDF) আমাদের ই-মেল এ পাঠান। সাথে ফটো থাকা চাই।
আমাদের E-mail: contactpandulipi@gmail.com
২) বানান ও যতি চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ প্রত্যাশিত।
৩) পাণ্ডুলিপি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখা ‘গুঞ্জন’ এর জন্য পাঠাবেন না।
৪) দয়া করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটা শেয়ার করুন।

হাসির ফোয়ারা

ঘামাচি

প্রণব কুমার বসু

যোগব্যায়ামের
আসন
কত
আয়নাখানা দেখে
পৌঁছানো কি যায় সহজে
হাতটা সঠিক রেখে –

ছোট্ট ছোট্ট মালগুলো সব
এত কিসের রাগ
শরীরটাকে জ্বালিয়ে দিলো
করেই নানান ভাগ –

নখগুলো সব খেয়ে ফেলেছি
একটুও ধার নাই
লাগবে কাজে জানতো কে বা
আসবে সময়টাই –

পাউডার আর কী যেন সব
লাগাতে যাই যত
এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে
লাগেনা ঠিকমতো –

ভুটুবাবুর ওষুধ যখন
দিয়েছিলেন ফ্রিতে
লাগিয়ে কত আরাম পেতাম
চলে যেতাম শুতে –

দিন যে এখন পাল্টে গেছে
নেই যে ছিটেফোঁটা
শুরু হলেই ছাদে গিয়ে
মারবো তোদের গোটা। ■

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

(৪)

পায়ে খুব ব্যথা, তাই বার বার পিছেয়ে পড়ছি। তাছাড়া পিঠের ব্যাগটাও খুব ভারী। আসন্ন শীতের জন্য এই ব্যাবস্থা। দিব্যানন্দজীর পরামর্শে এবার গ্রামের পথ ধরলাম। প্রথমে যে গ্রামটি পেলাম তার নাম রুষা। মন্দির লাগোয়া একটি বাড়ির সামনে আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম। একটি ছেলে এসে জানতে চাইলো আমরা চা খাবো কি না? হ্যাঁ বলাতে কিছুক্ষনের মধ্যে আমাদের জন্য নিয়ে এলো রুটি, সব্জী, চা। খাওয়ার পর ছেলেটির বৃদ্ধা মা আমাদের প্রত্যেককে পঁয়ত্রিশ টাকা করে দিলেন। বললেন এই বাড়ির দরজা পরিক্রমাবাসীদের জন্য সব সময় খোলা। মাতাজীকে নমস্কার করে এগিয়ে চললাম।

হঠাৎ একটি ষোলো সতেরো বছরের মেয়ে রাস্তা আগলে দাঁড়ালো। আমি তার হাতে দুটো লজেন্স দেওয়াতে বলল, আমার খুব খিদে পেয়েছে খেতে দাও। সঙ্গে খাবার তো কিছু নেই তাই ঐ পঁয়ত্রিশ টাকা মেয়েটিকে দিয়ে দিলাম। খুব খুশি হয়ে চলে গেল।

আমরা এলাম গোরক্ষপুর গ্রামে। এখানেও গোরক্ষনাথজী তপস্যা করে ছিলেন। এখানে সিবনী নদী নর্মদায় মিলিত

হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মালম্বী মানুষ এক সঙ্গে বাস করছে দেখলাম। একটি লোক দোকানের বারান্দায় নেশাগ্রস্থ হয়ে শুয়ে আছে। লোকটিকে দেখে খুব কষ্ট হলো। হীরার খনির সামনে দাঁড়িয়ে দিনের শেষে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরছে। সত্যি খুব দুর্ভাগ্যজনক। রবীন্দ্রনাথের কথায়ঃ

"যারা কাছে আছে, তারা কাছে থাক,
তারা তো পারে না জানিতে
তাদের চেয়েও তুমি কাছে আছ
আমার হৃদয়খনিতে।"

প্রায় তেইশ কিলোমিটার রাস্তা হাঁটা হয়ে গেল। সবে মাত্র বিকাল তিনটে বাজে। কিন্তু হাঁটতে আর পাচ্ছি না। দিব্যানন্দজী আমাদের একটি বড়ো বাড়ির সামনে এনে তুললেন। পাশেই বাচ্চাদের স্কুল। আমাদের আগে আরো চারজন পরিক্রমাকারী এখানে এসেছেন। খুব ক্লান্ত তাই শুয়ে পড়লাম। গ্রামটির নাম কনকধারা।

আজ বৃহস্পতি বার ৫/১১/১৫, কুয়াশার জন্য সকাল ৭.১৫ এর আগে বেরতে পারলাম না। পাঁচ কিলোমিটার চলার পর এক নাথ সম্প্রদায়ের সাধুর আশ্রমে থামলাম। ঠাণ্ডা জল ও চা খাওয়ার পর মহারাজ পঞ্চম নাথজী আমাদের কুকরা মঠ যাওয়ার রাস্তা বলে দিলেন। পুকুরের পাড় এবং মাঠের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলার পর গ্রামের রাস্তা পেলাম। রাস্তার নগ্ন রূপ আমাকে খুবই কষ্ট দিচ্ছিল, রাস্তা বলে কিছু নেই শুধু পাথর।

নমামি দেবী নর্মদে

দুই পায়ের আটটা ফোস্কা প্রিয়জনের মত অঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, তাই ওদের নিয়ে চলেছি। সত্যিকারের প্রিয়জন কখনই ছেড়ে যায় না। তাই ওরাও আছে। এই ভাবে প্রায় ১০ কিলোমিটার চলার পর গোমতী নদীর পাড়ে এক সাধুর কুঠির পেলাম, এখানে সদাবর্তের ব্যবস্থা আছে। পাশেই একটি মাধ্যমিক স্কুল আছে।

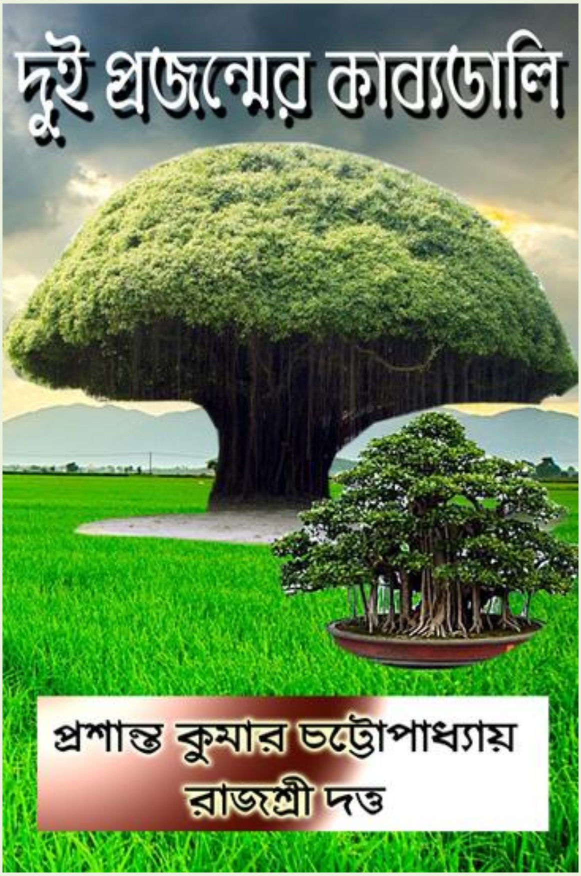
সাধু কুঠিরে কৃষ্ণচৈতন্য মহারাজ দিব্যানন্দজীকে সাথে নিয়ে আমাদের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজ তৈরি করতে বসে গেলেন। আমি বহু কষ্টে গোমতী নদীতে স্নান করে এলাম। ভোজন প্রসাদ নেওয়ার সময় দেখি ওই চারজন বাঙালি পরিক্রমাকারী এসে পড়েছে। তারা আজ এখানেই থাকবে। আমাদের তো থাকার উপায় নেই, তাই আবার এগিয়ে চলা। যাওয়ার আগে মহারাজ শিলমোহরটি আমাদের পরিচয়পত্রের পেছনে লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু এর সঠিক কারণটা কি আমার জানা নেই।

তিন কিলোমিটার চড়াই ওঠার পর আমরা এলাম কুকরা মঠে। রাস্তা এতই খারাপ যে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। তার ওপর দু’ পায়ে অসংখ্য ফোস্কা পড়েছে। কবিগুরুর ভাষায়ঃ

"তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা।
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলই হয়েছে বোঝা
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও –
ভারের বেগেতে চলেছি কোথায়, এ যাত্রা তুমি থামাও।"

একটি বড়ো গাছের তলায় ব্যাগটি নামিয়ে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম।

...ক্রমশ ■


দুই প্রজন্মের কাব্যডালি
প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
রাজশ্রী দত্ত

ঠিকানা

কেকা দাস

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে... আলার্মে সেট করা রিং টোনে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। রাত তিনটে বাজে, এখনি যদি না তৈরি হই, বেলা হয়ে যাবে। আমি চাইনা আমি যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি কেউ দেখে...

আমি অদিতি, অদিতি রায়। নিজের পরিশ্রমের করা বাড়ি থেকেই আজ আমি চলে যাবো...

কত স্মৃতি চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, মনে হচ্ছে সব – স...ব নিয়ে যাই...

ধুর মায়া করলে আর চলবে? যে মানুষ জন এতো আপন ছিল, যাদের জন্যে এতো হাড় ভাঙা খাটুনি তারাই আর আপন রইলো না, জিনিসপত্রের প্রতি মায়া করে কি লাভ!

বাবা যখন চলে গেলেন আমার আঠেরো বছর বয়স। তিন ভাই আর মায়ের আমি একমাত্র অভিভাবক হয়ে উঠলাম, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে।

ভাইগুলো তখন বড্ড ছোট, বড়জন বারো, মেজো দশ আর ছোট্টটা সাত। বিপদের দিনে আত্মীয়স্বজনকে যা ভীষণভাবে চেনা যায়, সেরকম ভাবে আমরাও চিনলাম।

চিরন্তন

বাবার জমানো সামান্য ক'টা টাকা আর মাথার উপরে একটা ঘরের ছাদ – এই নিয়েই শুরু হোলো আমার লড়াই। কাজের খোঁজে যে যা কাজ দিয়েছে সব – স...ব করেছি। একটু একটু করে পরিচিতি বেড়েছে, পাড়ার এক দাদার চেষ্টায় একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ পেয়েই নাইট কলেজে ভর্তি হয়েছি। সকাল বেলায় ভাইদের পড়িয়ে, অফিস করে, কলেজ করে ফিরতাম যখন তখন খাবার ইচ্ছা থাকতো না, ভাবতাম কখন বিছানায় গিয়ে ঘুমোবো।

সত্যি বলতে কি আমার তিনভাই পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিল, ফলে শত অসুবিধাতেও আমি পড়া বন্ধ করতে দিইনি। ওরা কলেজে উঠলো, এক একজন করে চাকরিও পেয়ে গেলো। আর আমার বিয়ের বয়স যে কবে পেরিয়ে গেলো বুঝতেও পারলাম না।

ভাইদের চাকরি পাবার পরে আত্মীয় সমাগম বাড়তে লাগল – আর আমি বিয়ে না করায় তাদের আফসোস শুরু হোল। শুরু হলো তাদের নিকট আত্মীয়দের সাথে ভাইদের বিয়ের সম্বন্ধ করা।

ভাইরা চাকরি পাবার আগেই আমি বাড়িতে হাত দিয়েছিলাম, নিচে দু'ট ঘর বাড়িয়ে ছাদ ঢালাই করে দোতলায় হাত দিয়েছিলাম। সকালে মায়ের হাতে হাতে কাজ করে সাড়ে আটটায় বেড়িয়ে পড়তাম।

চিরন্তন

বড় ভাইয়ের বিয়ে নিজে দেখে দিলাম, বউটা ভালো, কিন্তু সকালে ওঠে সেই আটটায় ফলে আমার কাজের কোন সুরাহা হলো না। ছোট দুটি তিন বছরের ব্যবধানে পর পর বিয়ে করলো নিজেরা দেখেই। বিয়ে করলো সংসারে লোক বাড়লো কিন্তু টাকা বাড়লো না।

আমার বেতন আগেও যেমন পুরোটাই সংসারে দিতাম তেমনি এখনো দিতে হয়, না কুলালে ভাইরা এটা সেটা কিনে এনে জোরাতাপ্পি দেয়। অফিসের পি.এফ. এর টাকা তুলে দোতলা সম্পূর্ন হোলো। লোক বেড়েছে ঘরের খুব দরকার। তিন ভাইয়েরই প্রত্যেকের দু’টি করে ছেলে আর একটা করে মেয়ে। ভাইদের ছেলেমেয়েগুলো ভারী মিষ্টি, ছুটির দিনগুলো খালি পিসি পিসি করে।

মা সব নাতি নাতনি দেখে যেতে পেরেছিলেন। সেদিন হঠাৎ ছোটভাই এসে বলল – দিদি তোর ঘরটা খুব বড়, তুই একা মানুষ এত বড় ঘর দিয়ে কি করবি! তাই ভাবছি ঐদিকের কোনের ঘরটা তুই নিলে আমরা একটু হাত পা ছড়িয়ে থাকতে পারি। যখন নতুন ঘর হচ্ছিল, তখন কিন্তু কেউ বলেনি দিদি আর মা নতুন ঘরে থাকবে... বাবার সময়ে করা ঘরেই আমি আর মা থাকতাম।

দু'বছর হল অবসর নিয়েছি, পেনশন নেই, জমানো টাকা বাড়ির পিছনে পুরো খরচ হয়ে গেছে, বুঝলাম ওদের আমাকে আর প্রয়োজন নেই।

ভাইয়ের কথাতে গলাতে জমাট ব্যাথা নিয়ে বললাম দাঁড়া একটু ভাবি। অফিস যেতে হয়না বলে সকাল থেকে রান্নাঘরেই ব্যস্ত থাকতে হয়। বৌয়েরা তরকারি কাটতে গিয়ে বা গল্পের ছলে প্রায়ই বলে – এই যুগে একজনকে বসিয়ে খাওয়ানোটা যে কি ঝকমারি...

ওদের এরকম কথায় বিস্ময় প্রকাশ করতেও ভুলে হয়ে যায়। মেয়েগুলো বড় হয়েছে, তাদেরও ঠেস মারা কথা বড্ড মনে লাগে। মাঝে মাঝে মনে মনে নিজেকে ঠাস ঠাস করে চর মারি আর বলি – হলো তো সংসার করা...

আমার ভাইয়েরা, আমার সংসার...

আশ মিটেছে তো!

এলার্মের শব্দে উঠে সারা বাড়ি চোরের মত ঘুরে এলাম। বড্ড মায়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে... সেদিন ভাগ্যিস পাড়ার সেই দাদার সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিল, যে আমায় চাকরি দিয়েছিল, হয়তো মনে মনে আমায় ভালোবাসত... বুঝেও না বোঝার ভান করতাম যে...

দাদারও বয়স হয়েছে, আমি সব খুলে বলতে বলল – অদিতি সব টাকা খরচ করে ভুল করেছো, সংসারে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। পারবে এখনো কোন দায়িত্ব নিতে? আমার ছেলে রাজা আমাদের দেশ গ্রামে এক আবাসিক স্কুল করেছে দুঃস্থ ছেলে মেয়েদের নিয়ে, তাদের মায়ের মত যত্ন করতে পারবে? রাজা খুঁজছে এক বিশ্বস্ত, পিছুটান নেই

এমন মহিলা, যদি পারো তাহলে সাত তারিখ সকাল ছটায় এসো। রাজা তোমায় সেখানে নিয়ে যাবে, দেখো পারো কিনা নতুন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নতুন ভাবে বাঁচতে...

আজ সেই সাত তারিখ, আমি চলেছি নতুন জীবনের, নতুন ঠিকানার খোঁজে... আপনারা আমায় আশীর্বাদ করবেন, ওই দুঃস্থ বাচ্চাদের যেন আমি ভালো 'মা' হতে পারি। ■

অথচ জানি ঠিক

নাহার আলম (বাংলাদেশ)

অথচ জানি ঠিক আমি —
মাঝখানে কিছু নেই — সব অদামি!
এমন ভাবনায় আজকাল আমি বেশ তড়পাই,
আর দিন গুনি বিরল এ অসুখের ছাড়পত্রের অপেক্ষায়।
বর্তমানের চলে যাওয়া মোহ নাদ,
থামলে অকস্মাৎ;
কি হবে তারপর?
পেরুলেই কি আসবে বিলাসী ভবিষ্যৎ?
জানি, উত্তর জানা নেই কোনো এর,
না আমার আর না কারো।
তবুও খানদানি ভাবনারা দঙ্গল বেঁধে এসে
ভিড় করে হাজারো।
অজানার মোলায়েম বিবরে এমনই জমা পড়ে রোজই কতো
না হলুদ হলুদ নক্ষত্র;
ঋতুমতী স্বস্তির চঞ্চল দোয়েলা তবুও ছুটে চলে ঊর্ধ্বশ্বাসে
আশার কার্নিশ ঘেঁষে সর্বত্র... ■

ছায়া-কায়া

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(৭)

বাসে যেতে যেতে সুধীরবাবু ভাবতে লাগলেন, কীভাবে এই জট খোলা যায়? পুলিশের সাহায্য নেবেন, নাকি অন্য কোন পথ খুঁজবেন! কারণ, এভাবে তো একটা সম্পর্ককে ভেঙে যেতে দেওয়া যায় না। যদিও আগের জয় আর আজকের জয়ের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান, তবুও এর কারণটা খুঁজে বার করা খুবই জরুরী। বাস থেকে নেমে এইসব ভাবতে ভাবতে আনমনে যেতে গিয়ে হঠাৎ সজোরে হাতে টান অনুভব করলেন, কে যেন পিছন থেকে তাঁকে টেনে চার-পাঁচ পা পিছনে নিয়ে গেল আর কানে এল — কি করছো? এভাবে আনমনে কেউ রাস্তা পার হয়, তাও আবার এই বাইপাসের রাস্তা, এখনি একটা দুর্ঘটনা হয়ে যেত।

সুধীরবাবু টাল সামলে দেখলেন, একটি সাদা পাজামা-চিকনের পাঞ্জাবী পরা, মাঝারি উচ্চতার মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক। কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ, হাতে দাদুর ছাতা।

লোকটি বললেন — সুধীরদা আমাকে চিনতে পারছ? বলো তো আমি কে?

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর সুধীরবাবু বললেন — তুমি দীনু মানে দীনেশ মিশ্র, তাই না? কত দিন পর দেখা, প্রায় বছর পঁচিশ পর। কত পাল্টে গিয়েছো? প্রথমে তো চিনতেই পারিনি। সেই কলেজ লাইফ, সেই নস্টালজিক স্মৃতি সব যেন তরতাজা হয়ে উঠল। শুনেছিলাম তুমি নাকি দেশের বাড়ি চলে গিয়েছিলে। ওখানেই একটা স্কুলে মাস্টারি করতে?

— হ্যাঁ ঠিক শুনেছো। এখনও করি। শুধু একটা বিশেষ কাজে কলকাতায় আসা আর কি...

— তা তুমি কোথায় আছো?

— ভেবেছিলাম কোনো হোটেলে থাকব। কিন্তু স্যার বললেন তাঁর বাড়িতেই থাকতে হবে। তাই অনুগত ছাত্রের মতো ওনার বাড়িতেই আছি।

— স্যার, মানে কোন স্যার?

— আরে তুমি ভুলে গিয়েছ, আমাদের ব্রজনাথ বাবু, সাইকোলজির প্রফেসর ছিলেন। তোমাকে খুব ভালবাসতেন। চলো না একটু দেখা করে আসবে। স্যার খুব খুশি হবেন।

— দীনু, আজ না। অন্য কোনোদিন যাব। ভাগ্নিটা বাড়িতে একা আছে। আর একটা সমস্যা নিয়ে খুব চিন্তিত আছি। ভেবেছিলাম সংসার ধর্ম নেই, একটা বাপ মা মরা ভাগ্নি

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

আছে তাকেও বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। এবার আমার ছুটি। সংসারত্যাগী হব। কিন্তু তা আর হল কোথায়! মায়া জীবনকে এক অদৃশ্য জালে জড়িয়ে রেখেছে। যত এর জট খোলার চেষ্টা করবে তত নতুন জট এসে যাবে। বলতে গেলে এক কথায় জটে জটে জটিল জীবন।

— কি হয়েছে? তোমাকে খুব চিন্তিত লাগছে? আমি কি তোমাকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারি?

— নাহ্ আজ থাক। স্যারের কাছে আসছি, সব বলব। স্যার এখনও ঐ পৈত্রিক ভিটেতেই থাকেন তো? স্যারের সাথে কিছু আলোচনা করতে হবে। আমি কাল উত্তর কলকাতায় স্যারের বাড়ি আসছি। তুমিও থাকবে কিন্তু দীনু।

— আচ্ছা বেশ আজ তবে আসি সুধীরদা।

সুধীরবাবু বাড়ি ফিরে রঞ্জনাকে গত রাতের ব্যাপারে কোন কথাই জানালেন না, আর ভোলাদাকেও জানাতে বারণ করে দিয়েছিলেন। তাই রঞ্জনার মনে হাজারো প্রশ্নের ঘাত-প্রতিঘাত চললেও, মামার কাছ থেকে কোনরূপ সদর্থক উত্তর সে পেল না। প্রতিদিনের কর্ম প্রবাহী জীবন স্রোতে অভিমানের ভাঙা পাথর নিয়ে এগিয়ে চলল রঞ্জনা।

...ক্রমশ ■

স্তুতি

সুমন্ত ভট্টাচার্য

সকালে উঠিয়া
আমি
মনে মনে বলি,
বৌ যাহা বলে যেন
তাহা মেনে চলি।

আদেশ করেন যাহা
মোর প্রাণ সখী,
আমি তাহা মানিলেই
হবো চির সুখী।

বাপ মাকে ভুলে যাও
ভোলো ভাই বোন,
বৌয়েরই পদতলে
রাখো সদা মন।

বৌয়ের কাপড় কাচো
করো পদ সেবা,
বৌ লাথি মারলেও
হয়ে থাকো বোবা। ■

খোয়াব

আবেগে-আশ্লেষে

রাখি ভৌমিক

তোমার মনের অঙ্গন জুড়ে করব আমি বাস
আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে তোমার
আশ্বাস।
যদি কখনো মান অভিমানের কালো মেঘ ছায়,
তোমার সাথে কাটানো মূহুর্তের আলোয়
তা ধুয়ে মুছে যাক। প্রেমের নিঃস্বার্থ আবেগে
নেমে আসুক এক আকাশ সুখানুভূতি মেখে। ■

পরিচয়

দীপঙ্কর সরকার (বাংলাদেশ)

চোখ বন্ধ করলেই চোখে ভাসে ফরিদপুর। সেখানে আর কেউ থাকে না। না না ভুল বললাম – কেউ কেউ হয়তো থাকে; কিন্তু আমার কেউ থাকে না। যা কিছু আমার নয়; আমার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়না; সে সব আমার পরিচয় নয়। প্রত্যেক মানুষের বোধহয় একটা পরিচয়ের দরকার পড়ে। যা কিছু আমার অস্তিত্বে মিশে থাকে তাই আমার পরিচয়।

সেই তালগাছ, বাবুইপাখির বাসা, পুকুর ঘাট এসবে মিশে আছে সোনালী শৈশব। সেগুলো এখনও ঠিক আগের মতোই আছে কি না দেখতে বড্ড ইচ্ছে করে। আমার মৃত্যুর সাথে জানি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ফরিদপুর; পরিবারের আর কেউ একগাল হেসে বলবে না – 'আমি হইলাম গিয়া ফরিদপুরের পোলা'। এসব আজকাল বড্ড মনে পড়ে।

মেঠোপথ এঁকেবেঁকে চলছে গ্রামের দিকে। দু'দিকে ধানক্ষেত। কান পাতলেই শিস দেয় ভোরের দোয়েল; শালিকের ঝাঁক দ্বন্দ্ব করে নিজেদের মধ্যে – কিছুক্ষণের মধ্যে মিটমাট হয়ে কোথাও যেন উড়াল দেয় ওরা। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব আজীবন চলতে পারে; তাই বলে পাখি? না না

অসম্পূর্ণতা

ওরা জানে না জীবনের মারপ্যাঁচ; পাখিনীতি আর রাজনীতি দুই-ই নীতি বটে, তবে রাজনীতিতে নীতির চূড়ান্ত স্খলনের নমুনা আর অন্য কোন প্রাণীতে নেই।

ফরিদপুরের গৈরিক মাটিতে চলে জীবনের বুনন। স্বপ্নগুলো ঘূর্ণিপাক খেতে থাকে চর্কির মতো। কেউ কেউ চাঁদের বুড়ির মতো সুতো কাটে; এ সুতো জীবনের সুতো। অনবরত সুতো কেটে যেতে হয় জীবনের চড়কায়।

গ্রামে ঢুকতেই গোপালদের বাড়ি। তারপর আর একটা বাড়ি। আর সাতখানা বাড়ি পেরুলে রাস্তার মোড়। বাঁক নিতেই হাতের ডানদিকে একটা পুকুর। পুকুরের পাড় ঘেঁষে কয়েকটা বাড়ি। আমাদের বাড়ি।

পুকুরপাড়ে সারি সারি সুপারি গাছ। অনেকগুলো সুপারিগাছের ভিড়ে অনাথের মতো একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি তালগাছ। অথচ সুপারি গাছগুলো বিদ্রোহ ঘোষণা করছে না। একবারও বলছে না, এ্যাঁই তালগাছ তুই এখানে ক্যান? আমাদের জমিতে? তোর কি ভিটেবাড়ি নেই?

এখানে সমজাতীয়দের মাঝে না থেকেও তালগাছ শরণার্থী না। বুক চিতিয়ে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। চোখ বন্ধ করলে, তাল পড়ার ধপাস শব্দ এখনো কানে ভাসে।

তালগাছে অসংখ্য বাবুই পাখির বাসা। কি সুনিপুণভাবে তৈরি প্রত্যেকটি বাসা। দূর থেকে সবার আগে সেই বাবুইয়ের বাসাগুলো চোখ পড়ে। মনে হয় এইতো জীবন;

অসম্পূর্ণতা

ঝুলে থাকা বটে তবুও নিজের বলে একটা বাড়ি আছে; পরিচয় আছে। পাখিদেরও পরিচয়ের দরকার পড়ে – সেখানে একজন মানুষ! দরকার পড়ে বৈ কি – পরিচয় ছাড়া মানুষ ঠিক মানুষ হয়ে ওঠে না।

অবাক দৃষ্টিতে বাবুইপাখির বাসা বানানো দেখতাম। কি নিখুঁত! এমন রুচিশীল প্রাণী মনে হয় পৃথিবীতে হাতে গোনা। সাইজে ছোট্ট বটে কিন্তু পরিশ্রম করার কি অসম্ভব ক্ষমতা। একটা একটা করে খড়কুটো আনে আর বুনে চলে নিজের অস্তিত্ব। তৈরি করে নিজের পরিচয়।

এখনো মনে পড়ে সেই রাতটা। কি ভয়াবহ ঝড় আর বৃষ্টি! মুহূর্তেই আমাদের ঘরের টিনের চাল উড়ে গেল। আমরা ভাই-বোন, মা-বাবা মিলে আশ্রয় নিলাম গোপালদের বাড়িতে। আমাদের গা ভিজে গেছে; কাকভেজার মতো জুবুথুবু হয়ে বসে আছি।

মাঝরাতে ঝড়বৃষ্টি থেমে গেল। প্রকৃতির গর্জন শেষে একটি শান্ত ও শীতল পরিবেশ। পরের দিন সকালে আমরা নতুন করে ঘরে চাল লাগালাম।

তালগাছের নিচে অনেকগুলো বাবুইপাখির বাসা খুলে পড়েছে। পাখিগুলো ডাকছে। ঠিক ডাকছে না, হয়তো কাঁদছে। আমাদের ঘরের চাল উড়ে যাওয়াতে যতটা কষ্ট পেয়েছি, তার চেয়েও বেশি কষ্ট পেয়েছি এটা দেখে।

অসম্পূর্ণতা

দেশে তখন যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। যে কোনো সময় পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ করতে পারে। ইতিমধ্যে মুজিব সাহেব ঘোষণা দিলেন – "যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।"

বাবা একবার সিদ্ধান্ত নেন এখানেই থাকবেন, মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত বদলান আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে। না, এদেশে আর থাকা যাবে না; ভারতেই যেতে হবে। দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কাছাকাছি একটা স্কুলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ক্যাম্প বসিয়েছে। যে কোনো দিন গ্রামে হামলা চালাতে পারে। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি মরে যাচ্ছি। বাঁচা মরার সন্ধিক্ষণে খুব অদ্ভুত লাগে।

একদিন রাতের অন্ধকারে আমরা সীমানা টপকালাম। সেই রাত ছিল আমার পরিচয়হীনতার রাত; আমার অস্তিত্ব সংকটের রাত। বাবার চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে। ঘন নিকষ কালো অন্ধকারের মাঝেও, বাবা বারবার পেছন ফিরে বাড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। অন্ধকার সব ঢেকে দিয়েছে, বাবা তবুও তাকাচ্ছেন। তবুও যেন দেখতে পাচ্ছেন সেই তালগাছ, পুকুরপাড় আর টিনের চাল...

সেই রাতে আমরা হয়ে গেলাম শরণার্থী; ঠিক ঐ তাল গাছটির মতো।

দেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীন হলো আমাদের ফরিদপুর। বাবা আর ফিরে এলেন না।

অসম্পূর্ণতা

আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে গেল ফরিদপুর। নিজের বলে আর কিছু রইলো না। পরগাছা হয়ে গেলাম। আজ এত বছর পরেও একটি পরিচয় খুঁজছি। এত বছর বাস করেও এন. আর. সি. তে নাম আসেনি। তবে কি আবার যেতে হবে নিজের জন্মভূমিতে শরণার্থী হয়ে? ফরিদপুর এখনও কি সেই ফরিদপুর আছে! আসাম আর ফরিদপুরের আকাশে প্রভেদ নেই; প্রভেদ একটি কাগজে। সীমানা সীমানায় দ্বন্দ্ব; দ্বন্দ্ব কাঁটা তারের। কাগজের কি শক্তি; একটি কাগজ আমাকে পরিচয়হীন করেছে। ফরিদপুরও আর সাক্ষ্য দেবে না যে আমি তার বঙ্গসন্তান; মরতে হবে কেবলমাত্র একটি পরিচয়হীনতার যন্ত্রণা নিয়ে।

ফেরার গল্প আমায় আর বোলো না। কোথায় ফিরবো? প্রলোভন! সে তো পেত্নীর ছলনা।

আমায় বোলো না
গাহিতে বোলো না
একি শুধু হাসি খেলা
প্রমোদের মেলা
শুধু মিছে কথা, ছলনা!

এখনও ফরিদপুরে স্বপ্নে যাই অহরহ। ছোট্ট একটা পুকুর। তালগাছ, ধানক্ষেত।

এই আমার পরিচয়। ■

মায়া

রাখী আঢ্য

সমর একদৃষ্টিতে ঘাটের সিঁড়িটায় বসে নদীর ঢেউ গুলোর ওঠানামা দেখছিল। একপশলা বৃষ্টি হওয়ায় হাওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা ভাব। শ্মশানে বাবার দাহ কার্য সম্পন্ন হবার পর সবাই চলে গেলেও সে যায়নি। এখানে একা বসে নিজের সাথে, বাবার স্মৃতির সাথে, থাকতে মন চাইল। নদীর ঢেউগুলো যখন মৃদু গতিতে ঘাটের সিঁড়িগুলোয় আছড়ে পড়ছে, তখন এক অপূর্ব সুর-ধ্বনির সৃষ্টি করছে – যা সঙ্গীতের থেকে কোন অংশে কম নয়। বাবা বড় সঙ্গীত ভালবাসতেন। সেও বাবার এই গুণটি পেয়েছে। বন্ধুরা বলে সে নাকি ভালো গায়। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে সমরের বুকের ভেতর থেকে কান্নার স্রোতটা আরো একবার বেরিয়ে আসতে চাইল। মিলিটারির চাকরিতে ছুটি প্রায় পাওয়া যায় না, যদিও বা অতি কষ্টে ছুটি পেল সে, তাও হলো না বাবার সঙ্গে দেখা।

হঠাৎ পিঠে একটা পরিচিত স্পর্শ পেয়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে সে চমকে উঠল... তখনো সমরের কাঁধে হাত দিয়ে তার সৌম্য দর্শন বাবা হাসছেন, তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাবুয়া, আর কতক্ষন এখানে বসে থাকবি? চল আমার সাথে। বেসক্যাম্পে গুলিবিদ্ধ হয়ে তোর মৃত্যু হয়েছে, এই খবর শুনেই তো আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল। এখন থেকে আমরা বাপবেটা একসাথে থাকব।"

"তাই চলো..." সমরের সহাস্য জবাব।

জন শূন্য ঘাটে শুধু নদীর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ■

ভালোবাসা কারে কয়

পিয়ালী চ্যাটার্জী মল্লিক

আমার ছোটবেলায় বাবা তার বন্ধু নিরুপম জেঠুকে কথা দিয়েছিল যে – তার একমাত্র কন্যার সাথে অর্থাৎ আমার সাথে নিরুপম জেঠুর একমাত্র পুত্রের বিবাহ দেবে। কথা মতোই ঠিক যখন উনিশ বছরে পা দিলাম সবে মাত্র প্রেম ভালোবাসার গল্প পড়তে শুরু করলাম, আশেপাশে প্রেমিক যুগল কে দেখে মনে প্রেমের ইচ্ছেরা বাসা বাঁধতে শুরু করলো – ঠিক তখনই, আমার সব ইচ্ছার অবসান ঘটিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে আমার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো অনুপমদার সাথে। ছোটবেলা থেকেই অনুপমদাকে চিনতাম, তবে একদিন যে ওর সাথেই আমার বিয়ে হবে সে কথা আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। অনুপমদা বোধহয় জানত সে কথা। যাই হোক, বিয়ের পরেরদিন কেঁদে-কেটে বিদায় জানাল আমাকে আমার এতদিনের সম্পর্কগুলো। আমিও সমাজের নিয়ম মেনে মা বাবার ঋণ তিন মুঠো চাল ছুঁড়ে দিয়ে শোধ করে বিদায় নিলাম।

বিয়ের পর যে বার প্রথম আমি আর অনুপম এক হলাম, যে মুহূর্তে অনুপম আমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখলো সেদিন

পরমার্থ

ভেবেছিলাম হয়তো এটাই ভালোবাসা। অনুপম অফিস যাওয়ার পর সারাদিন কাজের ফাঁকে অনুপমের অপেক্ষা করতাম। কখনো বা আগের রাতের আদরের কথা ভেবে আপন মনে লজ্জা পেতাম। অনুপমের শার্ট নিয়ে সেই শার্টের পারফিউমের গন্ধে নিজেকে ডুবিয়ে দিতাম। সন্ধে বেলায় যখন অনুপমের ফেরার সময় হত তখন চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক, আরো কত কি দিয়ে সাজিয়ে তুলতাম নিজেকে। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে অনুপমের চোখ থেকে দেখতে ইচ্ছা হতো। ঠিক যখন মগ্ন হতে শুরু করেছি ভালোবাসার মধ্যে, তখনই এক দুপুরে খবর পেলাম যে আমি অন্তঃসত্ত্বা। সত্যি বলতে কি, খবরটা শুনে খুশির থেকে ভয় বেশি পেয়েছিলাম।

আমি কি পারবো? এই প্রশ্নটাই মাথায় ঘুরপাক খেয়ে যেত সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। তবে এক সন্ধ্যায় যখন ভিতরে এক নিষ্পাপ প্রানের বেড়ে ওঠার আভাস পেলাম সেদিন বুঝলাম ভালোবাসা কি। অনুপম তখন তার অফিসের সহকর্মী সোমাকে নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ত হওয়াটাও স্বাভাবিক আমার কাছ থেকে তার যা চাওয়া তা আপাতত তার পাওয়া হচ্ছিল না। একদিন অনুপম ঘুমিয়ে পড়ার পর তার ফোনে "গুড নাইট হানি। লাভ ইউ।" মেসেজটা আসতে দেখে জানতে পারি সে কথা। তারপর থেকে এরকম অনেক ভাবেই সামনে এসেছে অনুপমের পরকীয়ার সত্যি। তাতে

পরমার্থ

যদিও আমার খারাপ লাগেনি কারণ ততদিনে আমার ভালোবাসার সংজ্ঞা বদলেছে। আমার কাছে ভালোবাসা মানে তখন আমার মধ্যে বেড়ে ওঠা সেই ছোট্ট প্রাণ।

বেশ কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পর একদিন আমার কোল আলো করে জন্ম নিলো আমার ছেলে অভিরাজ। মিথ্যে বলব না তবে মা হওয়ার পর বুঝতে পারলাম ত্যাগ কি জিনিস। রাত বিরেতে নিজের ঘুম ত্যাগ করে সন্তানের জন্যে জেগে থাকা, গরম জলে সন্তানকে স্নান করানোর আগে সেই জলে নিজের হাত যে কতবার পুড়িয়েছি তা খেয়াল নেই। সন্তানের আধ খাওয়া খাবার খেয়ে কত বেলা পেট ভরিয়েছি। নিজের জন্য শাড়ি কেনবার টাকা দিয়ে যখন অভিকে রিমোটের গাড়ি বা কোনো রোবট কিনে দিতাম, ওর মুখের হাসিটার মধ্যে ভালোবাসা খুঁজে পেতাম। তবে সে ভালোবাসাটাও বেশিদিন টিকলো না। যে বার স্কুলে খারাপ রেজাল্ট করায় ছেলেকে বকে ছিলাম সেই বার অনুপম বলেছিলো, "আমার ছেলে কে একদম বকবে না। ওর যেমন ইচ্ছা ও তেমন ভাবে চলবে।" তা শুনে অভি ও বলেছিল, "আমার বাবা সবচেয়ে ভালো।"

না তারপর থেকে অনুপমের ছেলে কে আর কোনো কিছুই বলিনি। নিজেকে অনেকটাই গুটিয়ে নিয়েছিলাম সকলের থেকে। একদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফেসবুক ঘাঁটছি, হঠাৎ একটা মেসেজ এলো "হাই, তোকে আজ

দেখলাম। ভালো লাগছিল অনেকদিন পর দেখে।" অচেনা কেউ না যদিও – স্কুলে পড়াকালীন একসাথেই পড়তো নাম – ঋজু বিশ্বাস। ছোটবেলায় খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল আমাদের সকলের। আজ আর তেমন বন্ধু কই। যাক উত্তর না দিলে খারাপ দেখায় তাই পাঠালাম, "ওহ কোথায় দেখলি?"

উত্তর এল - "একটা খেলনার দোকানে।"

মনে পড়ল অভির জন্মদিন সামনে, তাই ওর জন্য উপহার কিনতে গিয়েছিলাম। তখনই দেখেছে বোধহয়। আবার মেসেজ আসল, "আচ্ছা তোকে দেখে আগের মতো আর হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল লাগলো না। তোর জীবনে কি কোনো সমস্যা আছে?"

হাত লিখতে চাইল সমস্ত মনের কথা তবে – "না তেমন কিছুই না রে।" এই শব্দগুলি ছাড়া আর কিছুই লিখে উঠতে পারলাম না। সেদিনের মতো আর কথা হলো না, তবে পরের দিন আবার যেই রাতে ফেসবুকে ঢুকলাম অমনি মেসেজ আসল – "কেমন আছিস?"

লিখলাম, "ভালো তুই কেমন আছিস?" এই ভাবেই কথা হতে থাকে প্রায় প্রতিদিন। জানতে পারলাম, ঋজু এখন নাম করা এক কোম্পানীতে চাকরি করে। মা, বাবা এবং দিদির সাথে থাকে। ঋজুর বাড়ি আমার বাবার বাড়ির পাশের পাড়ায়। খুব বেশি দূরত্ব না। আমার বৈবাহিক জীবনের যখন সাত বছর পূর্ণ হতে চলেছে তখনও ঋজু

অবিবাহিত। কয়জন পুরুষই বা আমাদের মতো কম বয়সে বিয়ে করে? সে যাই হোক, আমাদের এই প্রতিদিন রাতের কথাবার্তাগুলো কেমন যেন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে লাগলো আমার কাছে।

আসতে আসতে সেই রাতের কথোপকথনগুলো সারাদিনের হিসেব-নিকেশে বদলে গেল। আমরা একে অপরের সব থেকে কাছের মানুষ হয়ে উঠলাম নিজেদের অজান্তেই। তবে এইবারের ভালোবাসাটায় কারুর কোনো চাওয়া পাওয়া ছিল না – ছিল শুধু একটাই ইচ্ছা যাতে অপরজন ভালো থাকে। এক দু' বার দেখা করেছি বাইরে, তবে ঋজু কখনো আমার হাতটাও ধরেনি। এই ভালোবাসাটা আমাকে শিখিয়েছে কিভাবে নিঃস্বার্থ হয়ে ভালোবাসা যায়। ঋজু প্রতিটা মুহূর্তে আমার ভালো থাকার কথাই মাথায় রাখত। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ত, তখন লুকিয়ে কখনো ছাদে বা কখনো বারান্দায় ফোনে গল্প করতাম আমরা দুজন। সে গল্পের বেশিরভাগই থাকতো আমাদের স্কুলের বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে। এই ভালোবাসাটা নিয়ে আমি দিব্যি সুখে ছিলাম, বুঝেছিলাম ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ – তবে ঠিক তখনই ঋজুর বাড়ি থেকে ওর জন্য বিয়ে ঠিক করা হলো। ঋজু কি করবে জানতে চাইলে আমিই তাকে বিয়েটা করে নিতে বলি, কারণ ততদিনে আমার কাছে ভালোবাসার সংজ্ঞাটা খুবই পরিষ্কার।

পরমার্থ

"একজন মানুষকে ভালোবাসলে তাকে নিজের করে পেতে হয়না। মনে ভালোবাসার অনুভূতি থাকলেই তাকে পাওয়া যায় কখনো ভাবনায়, কখনো শব্দে, কখনো নিস্তব্ধতায়, কখনো স্বপ্নে বা কখনো কোনো গানের লাইনে।"

ঋজুর বিয়েতে খুব মজা করেছিলাম। অনুপম, অভি আর আমি আমরা তিনজনেই গিয়েছিলাম। ঋজুর বউটাও খুব ভালো হয়েছে। যেমন মিষ্টি দেখতে, তেমন ভালো স্বভাব। ঋজু ভালোই থাকবে নতুন সংসারে। বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে আসার আগে ঋজু কে বিদায় জানাতে গেলে, ঋজু সবার চোখের আড়ালে হাতে একটা চিরকুট দিয়ে চলে গেল। খুলে দেখলাম তাতে লেখা, "তোকে আমি সেই ছোটবেলা থেকেই পছন্দ করতাম, তবে তখন বলতে পারিনি। যখন বলবো ভাবলাম তখন তোর বিয়ে হয়ে গেল। এখন যখন তোকে পেলাম, তখন আমাকে বিয়ে করতে হলো। এই জন্মে তো তোকে পাওয়া হলো না, তবে যদি পরজন্ম বলে কিছু হয়, তাহলে তুই শুধু আমারই হবি। ভালো থাকিস বন্ধু।"

ঋজুর সাথে যে আর কথা হয়নি তা না। ওরা হানিমুনে গিয়েছিল মালদ্বীপে, সেখান থেকে আমাকে ওর বউ অন্বেষার সাথে ছবি পাঠিয়েছিল। আগের মাসে মেয়ে হয়েছে ওদের। ঋজু আমার নামেই মেয়ের নাম রেখেছে তনয়া। বলেছিল, "তোকে তো পাওয়া হলো না, তাই আমি নিজের

মেয়ের মধ্যেই তোকে খুঁজে নেব।" এতটা পবিত্র চিন্তা যে আমাকে নিয়ে কারুর থাকতে পারে, তা আগে বুঝিনি। অন্বেষাকে ঋজু যথেষ্ট ভালোবাসে, সেটা ঋজু কখনোই অস্বীকার করেনি।

##

আজ অনুপম চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করল। অভি কলেজ পাশ করে ভালো চাকরিতে ঢুকেছে চার বছর আগে। অভির জীবনের দরজায় ভালোবাসা কড়া নেড়েছে বহু আগে। আমাদের দুই বাড়ির থেকেই কোনো অমত ছিলনা ওদের সম্পর্ক নিয়ে। অভি বিয়ের পর বউয়ের সাথে নতুন ফ্ল্যাটে স্থান পরিবর্তন করেছে। মাঝে মধ্যে আসে আমাদের দেখে যেতে। অনুপমের জীবনে এই মুহূর্তে আর কোনো সোমা নেই। এই মুহূর্তে অনুপমের চাওয়া পাওয়া কেবল একটি মানুষ যে দিবা-রাত্রি তার খেয়াল রাখবে, তাকে সময় সময় খেতে দেবে, তার সাথে দু'টো মিনিট সুখ দুঃখের আলাপ আলোচনা করবে – আর চোখের সামনে তেমন মানুষ আমি ছাড়া আর কেউ নেই। তাই ইদানিং অনুপমের কাছে আমি তার সবচেয়ে কাছের হয়ে উঠেছি আবার।

##

ঠিক যখন অনুপমের মধ্যে নিজের অস্তিত্বটা খুঁজে পেতে শুরু করেছিলাম তখনই একদিন অনুপম আমাকে চির বিদায় জানিয়ে পরলোকে পাড়ি দিল।

পরমার্থ

ছেলে বলেছিল তার ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকতে, তবে এতগুলো বছরের স্মৃতির মায়া ছেড়ে চলে যেতে পারিনি। এই বাড়িতেইতো প্রথম অনুপম আমাকে আপন করেছিল। এই বাড়িতেই আছে আমার মাতৃত্বের স্মৃতি। এই বাড়িতে আমার ছোট্ট অভির বেড়ে ওঠার সব স্মৃতি এখনো জীবন্ত। এমন কি এই বারান্দাতেই ঋজুর সাথে কত সুখ দুঃখের কথা হয়েছে।

জীবনে এত গুলো ভালোবাসার অর্থ বোঝার পর কেবল একটি গানই বারংবার গেয়ে যেতে ইচ্ছা হয় আমারঃ

"সখী, ভাবনা কাহারে বলে।
সখী, যাতনা কাহারে বলে।
তোমরা যে বলো দিবস-রজনী
'ভালোবাসা' 'ভালোবাসা'—
সখী, ভালোবাসা কারে কয়!
সে কি কেবলই যাতনাময়।" ■

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

দুঃস্বপ্নের রাতে আমরা কজন

স্বাগতা পাঠক

(২)

গল্প শুনলে জানা যায় ওটা ছিল কোনো এক জমিদারের কোঠা বাড়ি, বাইজি নাচ হতো। কোনো এক রাতে দূর্ঘটনা বসত ওই বাড়িতে আগুন লাগে আর ঐখানে থাকা চারজন বাইজি পুড়ে মারা যায়। এবং তাদের অতৃপ্ত আত্মা এখনও ওই বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়। রাইএর কথা তখনও শেষ হয়নি, হঠাৎ একটা ঝনাৎ করে শব্দে খাটের ধারে রাখা পাকোরার খালি থালাটা মেঝেতে যেই পড়েছে, অমনি অনুরাধা আমি আর অর্ণব প্রায় চিৎকার দিয়ে দেওয়ালের গায়ে সেটে গেলাম, সেটা দেখে প্রমথেশ আর রাই হেসে উঠল। প্রমথেশ বললো, হ্যাঁরে রাই এরা যাবে নাকি হন্টেড হাউস এক্সপ্লোর করতে!

এবার আমার বড্ড প্রেস্টিজে লাগলো, আচমকা আওয়াজে যে কেউ ভয় পায় – তাই বলে এইভাবে অপমান! আমি আবেগের বসে রাইকে বললাম, তুই তোর কাকা কাকির সাথে কথা বলে রাখ – আর কেউ যাক আর না যাক আমি যাব। অর্ণবও বলল, হ্যাঁ রাই আমিও যাব, প্রমথেশও যেতে রাজি, শুধু অনু চুপচাপ। আমরা সকলে এবার অনুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম, সে আমতা আমতা

করে বলল, তোরা সবাই যখন যাবি আমি একা বাড়ীতে বসে আর কি করব?

সেই কথা মতো আমাদের যাওয়ার দিন স্থির হলো ৬ ই অগাস্ট। সকাল ৯ টা ২২ মিনিটে শিয়ালদাহ থেকে হাসনাবাদ লোকাল ধরবো। রাই ফোনে ওর কাকু কাকিমাকে বলে রেখেছিল আমরা যাবো। বাড়িতে জানালাম রাইয়ের কাকুর বাড়ি যাবো তাই আমাদের পারমিশন পেতে কোনো অসুবিধে হলো না। তবে ভূতের বাড়ির অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলিনি; সেটা বললে আমাদের ছাড়পত্র আর পাওয়া হতনা।

নির্ধারিত দিনে সকাল সকাল তল্পিতল্পা গুছিয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম শিয়ালদাহ স্টেশনে, ট্রেন আসতে তখনও মিনিট ২০ বাকি। সকাল থেকেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে, ক্যাব ভাড়া করেছিলাম বাড়ি থেকে তাই আমাদের ভিজতে হয়নি। কিন্তু রাই বলেছিল দুই সেট জামা কাপড় এক্সট্রা নিতে – কারণ টাকি স্টেশনে নেমে ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ঐখানে ক্যাব পাওয়া যাবে না, পাতি ভ্যান বা টোটো গাড়ি করে গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে।

ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়া, তাই এরমধ্যেই আমাদের এক রাউন্ড চা হয়ে গিয়েছে।

এর মধ্যে ট্রেনের খবর হয়ে গেল, সাত নম্বরে আমাদের ট্রেন, একদম ফাঁকা, সিট পেয়ে গেলাম অনায়াসে এবার ঘণ্টা

দুয়েকের জার্নি খুব ভালোভাবেই কাটবে, বৃষ্টির ছাঁট আসবে তাই জালনার কাচ গুলো নামানো। ট্রেন ছাড়তেই, প্রমথেশ রাইকে জিজ্ঞেস করল, হ্যারে রাই, এই যে ভুতুড়ে বাড়ির কথা বললি, এইখানে কি কেউ কখনো গিয়েছে এক্সপ্লোর করতে?

রাই বলল, হ্যাঁ কাকিমনির কাছে শুনেছিলাম কলকাতা থেকে একবার না দু'বার কিছু গ্রুপ এসেছিল। তারা থেকেছিল ওই বাড়িতে রাতে, কিন্তু তাদের অনেকে বলেছেন সব ভুয়ো মিথ্যে রটনা, আবার অনেকে বলেছেন নাকি কিছু একটা বিষয়ের অস্তিত্ব আছে। তবে নিজের চোখে না দেখে তো কিছু বলা যায় না।

আমি অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বললাম হ্যাঁরে, তুই তোর ক্যামেরাটা এনেছিস তো?

অর্ণব বলল, সেটা কি আর ভুল হয়। হঠাৎ আমাদের চোখ পড়ল আমাদের আলোচনার দিকে অনুরাধার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, সে ব্যাগ থেকে টুক টুক করে বের করে মাঝে মাঝেই কি যেন মুখে পুড়ছে।

প্রমথেশ ওর হাতটা ধরে বলল, কি খাচ্ছিস রে? অনুর হাতটা নিজের নাকের কাছে এনে সেটা একজন দক্ষ গোয়েন্দার মতো গন্ধ শুঁকে প্রমথেশ বলল, অসভ্য মেয়ে ও চিংড়ি মাছের বড়া নিশ্চয়ই কাকিমা পাঠিয়েছেন আমাদের সবার জন্য আর তুই একা একা খাচ্ছিস? এই বলে অনুরাধার

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

হাতের অর্ধেক বড়া চিলের মতো আক্রমণ করে প্রমথেশ তা নিজের গালে পুরে নিল। তারপর আমাদের সকলের আক্রমণ ওর ব্যাগের উপর, একটা বড় টিফিন কৌটোর মধ্যে কম করে হবেই ২৫-৩০ টা ছোটো ছোট বড়া। নিমেষের মধ্যে আমরা সেসব সাবার করে দিলাম।

অনু এবার কাচুমাচু মুখ করে বলল, ঠিক এই কারণেই তোদের বলিনি। ওর কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে আমরা হাসিতে মেতে উঠলাম।

গল্প আড্ডাতে আমাদের যাত্রা বেশ সুন্দর ভাবেই কেটে গেল। ট্রেনে করে এই লাইনে তেমন যাতায়াত নেই, তাই বারাসাতের পর থেকে বিভিন্ন স্টেশনের নামগুলো কেমন খটমট লাগতে লাগল, আর রাই পর পর কোন স্টেশন আসবে বলে যেতে থাকল, ওর সবই জানা, সেটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু একটা গ্রামের সবুজ ছোঁয়ার মধ্যে যে ডুবে যাচ্ছি সেটা চলন্ত ট্রেনে দুই পাশের সবুজে ঘেরা মাঠ আর গাছ গাছালি দেখেই বুঝতে পারছিলাম। সত্যি এই পথে না আসলে বুঝি কোনো দিন জানাই হত না গ্রাম বাংলার বৃষ্টিও এতো সুন্দর আর মায়াবী। বীরাটি স্টেশন পার হতেই বৃষ্টিটা একটু ধরতে জানলার কাচটা তুললাম, তারপর ভ্যাবলা হল্ট পার হবার পর মুষল ধারায় বৃষ্টি শুরু হলো, যা থামার কোনো নাম নেই। বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল, তারপর নিমদারী স্টেশন পার হতেই, রাই বলল, ব্যাগ পত্র কাঁধে নিয়ে রেডি হতে – এর পরেই টাকি স্টেশন। ...ক্রমশ ■

চালচিত্র

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি.কে.)

অবুঝ হাওয়ারা আজো বুঝলনা জীবনের গণিত,
তাই তারা এদিকে ওদিকে বয়ে যায়...
জড় করে আরো অনেক নতুন খেলার সাথী,
অলীকের সুর যাদের মনকে মাতায়।

মেলার হিড়িকে, অথবা নতুন গানের লিরিকে,
যে মানুষ বার বার নিজেকে হারিয়ে ফেলে,
সে তো আজ সাবান-ফেনার বুদবুদ –
সুখ তার টিকিটাকে দোলা দিয়ে খেলে।

জনপদে আজকাল, অনেক সদানন্দ গাধা
লেজ নেড়ে নেড়ে চলে, আর গায় ঋতু বদলের গান।
কিছু ষাঁড় ভ্যাঁ ভ্যাঁ রবে দৌড়োয় এদিক ওদিক...
কবিরা কাচ-ঘরে বসে অবিরাম ধূমপান করে যান।

অনেকেই বেশ চেয়ে আছেন সুনীল আকাশ পানে,
তাঁদের ঠিকানা বদলে যাচ্ছে সমতল থেকে বহুতলে...
কেবল পাগল ছাগল মাটির ওপর গজিয়ে ওঠা
সবুজ ঘাসের গোছা চিবিয়ে চিবিয়ে, ঢিমে তালে চলে।

পরিবর্তন

কেউ ভাবছেন চা-ওয়ালা ঢেলে দেবেন
সোনার ভাঁড়েতে বিনে পয়সার চা...
কেউবা আবার মশগুল স্বদেশী সুরার ঘ্রাণে...
কীটগণ কোটিপতি, ধুলায় গড়ায় আবাম দ্বিপদের ছা।

স্বাধীন দেশেও থেমেছে কি বাঁচার লড়াই?
দু'শ বছরের উতপীড়নের আচার,
নতুন লেফাফায় মোড়া শোষণের নবীন কর্মসূচী...
ব্যক্তিস্বার্থ জলাঞ্জলি? না না সে যে পরম ব্যাভিচার... ■



নিষ্ঠুর সমাজ

লিপিকা দত্ত সরকার

"যখন রাত্রি নিঝুম,
নেই চোখে ঘুম,
একলা শূন্য ঘরে,
তোমায় মনে পড়ে মা গো,
তোমায় মনে পড়ে।"

ধর্মীয় ভাবে বিখ্যাত এক শহরের একটি দোতলা নার্সিংহোমে, ১৬ টি বেডে চার দিনে জন্ম নিয়েছে ১৫ টি পুত্র সন্তান।

একটু বেলায় ভর্তি হোলেন একজন যুবতী। সাত মাসের সন্তান সম্ভবা। ডাক্তার দেখে বললেন, এমনি নয় – প্রসব যন্ত্রণা তুলে স্বাভাবিকভাবেই গর্ভপাত করানো হবে। নতুবা মেয়েটির জীবনের ঝুঁকি আছে। লেবার পেইন তুলে, স্বাভাবিকভাবেই মেয়েটি জন্ম দিল এক পুত্রসন্তানের।

সাধারণত জন্মের পর, শিশু কেঁদে উঠলে এবং সুস্থ থাকলে, নার্সেরা প্রতিটি শিশুকে পরিস্কার করে একটি পরিচ্ছন্ন কাপড়ে জড়িয়ে, মায়ের কাছে বা বেবীকটে রেখে যায়।

কিন্তু, ঐ শিশুটির জন্মের পর তাকে কেউ পরিস্কার করলো না। যে গামলাগুলোতে মায়েরা প্রস্রাব ও বমি করেন,

ভাবুন

সেই গামলায় কোন আবরন ছাড়া ফেলে রেখে দেওয়া হল ঐ নবজাতকটিকে, মৃত্যুর অপেক্ষায়।

শিশুটি কাঁদতে লাগলো কখনো, কখনো বা ছোট্ট ছোট্ট হাত পা নিয়ে খেলতে লাগলো। কখনো বা ক্ষিধের জ্বালায় আঙুল চুষতে লাগলো।

"দূর অজানার কল্লোলোকের
ওপার হোতে,
সাত সাগরের অন্ধকারের
অকূল স্রোতে,
সূর্যলোকের আর্শীবাদে,
আলোয় এলাম চলে,
মানুষ হবো বোলে,
মা মাগো মা, মাগো মা..."

সকল নার্স ও আয়ারা শুধু ঐ শিশুর কথাই বলতে লাগল। কিন্তু কেউই নিজের হাতে তাকে মারতে রাজি নয়। বাড়ির লোক অপেক্ষা করতে লাগল – অযত্নে ও অনাহারে কখন শিশুটি মারা গিয়ে তাদের কন্যাকে পবিত্র প্রমাণ করবে। কুমারীর সার্টিফিকেট দেবে।

শিশুটি যখন সারা রাত কেঁদে চলেছে, কেউ গোপনে একটু জল ওর মুখে দিয়ে আসছেন। আর গোপনে নিজের চোখের জল মুছে চলেছেন। ভেবে দেখুন ঐ নবজাতকের কপাল। একটুও মাতৃসুধা বা মাতৃস্নেহ তার ভাগ্যে নেই।

সারাদিন ঐ গামলায় এমনিই ফেলে রাখা হলো – যদি বিড়াল বা কুকুর মুখে করে নিয়ে গিয়ে ল্যাটা চুকিয়ে দেয়। কিন্তু না। কেউ কিছুই করলো না।

রাতে সকলের চোখের আড়ালে শিশুটিকে ঐ গামলার উপরে, আরেকটি গামলা দিয়ে ঢেকে রাখে কেউ আবার। ঐ বদ্ধ জায়গায়, অনাহারে, অযত্নে দ্বিতীয় দিনেও বেঁচে আছে শিশুপুত্রটি। তারপর আর জানা নেই কি হোলো অবশেষে...

সকলে বলছেন, ঐ মাকে কোমরে দড়ি পরিয়ে জেলে দেওয়া দরকার। এত নিষ্ঠুর মা? মা কিন্তু শিশুটিকে ছাড়তে চাইছিলেন না। কিন্তু অসহায় ছিলেন তিনি সেই মুহূর্তে – পরিবার-পরিবেশ-সমাজ-অর্থ সবকিছুর কাছে। সকলের সমান মনোবল থাকে না – সিঙ্গেল মাদার হবার।

যৌবনের উদ্দাম আনন্দের উপহার ঐ নবজাতক। কিন্তু ঐ নিষ্পাপ শিশুর কি অপরাধ? কেন তাকে এই নিষ্ঠুর জগতে বেঁচে থাকার জন্য, এত মাসুল দিতে হচ্ছে?

দোষী কে বা কারা? শুধুমাত্র দোষী কি তার মা?

যদি যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ করার এতই শখ ছিল, তবে প্রথমে কেন সচেতন হোলেন না শিশুটির মা? যখন উন্মত্ত আনন্দ ভোগ করার পর, নতুনের আগমন বার্তা যুবতীর কাছে এলো, তখন কেন তাকে আরো বেড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া হলো? আজ কেন তাদের অসামাজিক আনন্দের বলিদান ঐ শিশুটি, বলতে পারেন? কেন ছোট্ট শিশুটি এত যন্ত্রণা সহ্য করে চলেছে?

আজ অপমানের বোঝা বয়ে চলেছে কুমারী নারীটি। কিন্তু সমান দোষী কি ঐ হৃদয়হীন পুরুষটিও নয়? সমাজে সমান দোষী হওয়া সত্ত্বেও, পুরুষ গঙ্গাজল ও তুলসীপাতায় ধোয়া হবে কেন?

আমাদের সমাজ বলে, নারীদের সচেতন হতে হবে। পুরুষ সোনার আংটি। যদি সমাজে দোষ করলে পুরুষের সমান কলঙ্কের বোঝা বইতে হতো, তাহলে... ধরা পড়লে, শাস্তির ব্যাপার আলাদা এবং সেটা আছেই।

এবার দোষী কি ঐ মেয়েটির বাবা ও মা একটুও নয়? কেন সাত মাসের শিশুপুত্রকে মৃত্যুর অপেক্ষায় ফেলে রেখে, ধুয়ে মুছে মেয়েকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা? শিশুর প্রতি, একটি ছোট্ট প্রাণের প্রতি কোনো কর্তব্য নেই তাঁদের? তাঁরা কেমন বাবা-মা?

ঐ ডাক্তার, যিনি সাত মাসের শিশুপুত্রকে নষ্ট করতে স্বচ্ছন্দে রাজি হলেন শুধুমাত্র একগাদা টাকার বিনিময়ে, তিনি কি নির্দোষ?

একজন ডাক্তার মানুষের জীবন দান করবেন বলেই ব্রত গ্রহণ করেন। তাই ঈশ্বরের পরেই ডাক্তারের স্থান। শুধুমাত্র অর্থলিপ্সা একটি বা সহস্র প্রাণের বাঁচার অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে এইভাবে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এই অর্থের মূল্য মারাত্মক বিষের সমান।

ঐ নার্সিংহোমের মালিক? তিনি কি নিরপরাধ? যদি তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতেন প্রতিটি মানুষের জীবনকে বাঁচাতে, যদি মন

ভাবুন

প্রাণ দিয়ে চাইতেন নবজাতক বা নবজাতিকাকে এই পৃথিবীর আলো দেখাতে আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে আমার নার্সিংহোমে, তাহলে? যদি ভাবতেন কোনো প্রাণকে অর্থের জন্য বা অবহেলাতে শেষ হতে দেবো না আমার নার্সিংহোমে। তাহলে আজ ঐ শিশুটির এই নির্মম পরিণতি হোতো কি ?

কত দম্পতি একটি শিশুর জন্য সারাজীবন কেঁদে কেঁদে মরে যাচ্ছেন, কত সংসার একটি সন্তানের জন্য ছাড়খাড় হচ্ছে, সেখানে প্রতিদিন কত প্রাণকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হচ্ছে নানা রকম পদ্ধতিতে।

এই সব মানুষদের জানোয়ার বললে, জানোয়ারদের অপমান করা হয়। পশু-পাখিও নিজের সন্তানকে রক্ষা করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে।

আর আমারা সর্ব জীবের শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে এমন নিষ্ঠুর কর্ম করে চলেছি? এতটুকু ভয় কাজ করে না মনে? হৃদয় কাঁদে না কখনও? বিবেকের দংশন হয় না নীরবে? মিথ্যা মানের ভড়ং দেখাতে, হুঁশ আমাদের অবশিষ্ট আছে কি আর? আমরা সত্যিই মানুষ তো?

"হে ঈশ্বর, এরা জানে না, এরা কি অপরাধ করছে। তুমি এদের ক্ষমা কোরো।" ■

"When God creates the miracle of life inside a woman's womb, it is not our place as human beings to extinguish that life."

Clyde Chambliss, Republican Lawmaker, US

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।



বি.দ্র.: নভেম্বর সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ২২শে অক্টোবার, ২০১৯।

ভ্রমণ কাহিনী

ডেসার্ট ট্রায়াঙ্গল

(জয়শলমীর পর্ব, তৃতীয় অধ্যায়)

মালা মুখার্জী

অটো ড্রাইভার দুর্গের ইতিহাস বলতে বলতে চললেন। প্রাচীন যুগে এই অঞ্চল মাহারওয়াল নামে পরিচিত ছিল। রাজা জয়সল সিংহ ১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিকূট পাহাড়ের ওপর এই কেল্লা বসান। মধ্য এশিয়া থেকে ক্রমাগত আক্রমণই ছিল এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ। জয়শলমীর মানে রাজা জয়শলের পাহাড়ি কেল্লা।

আমাদের প্রথম দ্রষ্টব্য হলো একটি সুবিশাল কামান। এখান থেকে নীচেটা পুরো দেখা যায়। তারপর সোনার অলিগলি দিয়ে ছোট ছোট সোনার বাড়ী ছাড়িয়ে চললাম হাভেলী দেখতে। ফোর্টের নীচের অংশে সাধারণ মানুষের বাড়ী, ছোট ছোট, একতলা বা দোতলা। উঁচু অংশে হাভেলী বা বড় মানুষের বাড়ী। একদম সেন্টারে রাজার প্যালেস। সামাজিক স্তর ভালভাবে প্রকটিত ।

বড়া হাভেলী আর আরো কয়েকটি হাভেলীর ভিতর দেখার পরই পা ব্যথা করতে পারে। বেশ উঁচু উঁচু সিড়ি। ভিতরে পুরানো জমা কাপড়, রেডিও থেকে শুরু করে তামার

পয়সা, দলিল দস্তাবেজ, সোনার বিগ্রহ, তৈলচিত্র, রান্নাবান্নার সরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্র সব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা। হাভেলীর পর রয়েছে জৈন মন্দির, যার অপরূপ কারুকাজ মাউন্ট আবুর দিলওয়াড়া মন্দিরকেই মনে করাবে, তবে এখানে শুধু মার্বেল নয়, সোনালী বেলেপাথরও ব্যবহার করা হয়েছে। দিলওয়াড়া মন্দিরে ছবি তোলা নিষিদ্ধ, কিন্তু এখানে সে সাধ পূর্ণ করা সম্ভব, মাত্র ত্রিশটাকার টিকিটেই। এই মন্দির পঞ্চদশ শতকে নির্মিত, কেল্লার বাইরে মুসলিম আক্রমণে বিনষ্ট হলে জৈনসাধুরা জয়শলমীরের রাওয়ালের শরণাপন্ন হন। এই মন্দিরটি অষ্টম জৈন তীর্থঙ্কর চন্দ্রপ্রভুকে উৎসর্গ করা, মন্দির গাত্রে জৈন মূর্তির সাথে সাথে হিন্দু দেবদেবী – বিশেষত মহেশ্বর আর পার্বতীর মূর্তি চোখে পড়বে, যা মহরাওয়লের পৃষ্ঠপোষকতায় বাননো হয়। এই মন্দিরটি দেখতেই ঘন্টা খানেক লাগবে। এরপর একটা বিষ্ণু মন্দির দেখে দেখতে গেলাম রাজবাড়ীর মিউজিয়ম। যোধপুরের মেহেরণগড়ের মতোই অস্ত্র শস্ত্রে ভরা সংগ্রহশালা।

সব শেষে চললাম মুকুলের বাড়ী দেখতে। এটা বাঙালীদের পীঠস্থান। ভাঙাচোরা বাড়ীটিকে ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে মনে হবে এই বুঝি সময়ের সরণী বেয়ে মুকুল এসে দাঁড়াবে সামনে, ময়ূর দেখে হাততালি দিয়ে উঠবে। তবে এখন আর এখানে ময়ূর নেই। সোনার কেল্লা দেখা শেষ হলে, আমরা চললাম পাটওয়ান কি হাভেলি আর

সেলিম সিংয়ের হাভেলী দেখে বর্তমান রাজপ্রাসাদ দেখতে। যেখানে অপেক্ষা করে আছে মাহারওয়ালের অন্য ইতিহাস। মাহারওয়াল নামটা শুনে অবাক হবেন না, ওটা জয়শলমীরের প্রাচীন নাম। যার উত্তরে জংলাদেশ বা বিকানীর আর পূর্বে হল মারওয়াড় বা যোধপুর।



চিত্র পরিচয়ঃ ওপরে বাঁদিকে সোনার কেল্লা, পাশে কেল্লার ওপর থেকে জয়শলমীর ও নীচে মুকুলের বাড়ী...

জয়শলমীর এককালে সমৃদ্ধ সিল্করুটে পড়ত। এখানকার রেশম ব্যবসায়ী গুমনচাঁদ পাটোয়া এতটাই ধনী ছিলেন যে

তাঁর পাঁচছেলের জন্য পাঁচটা হাভেলী বানান (১৮০৫ সালে)। এটা জয়শলমীরের প্রথম হাভেলী। এই হাভেলীতে ছবি ও দেওয়ালের মিরর ওয়ার্ক দেখার মতো। এরপরের গন্তব্য সালিম সিংয়ের হাভেলী। আশা করি কুলধারার কাহিনী ও দেওয়ান সালিম সিংকে পাঠকগন ভোলেননি। এরপরের গন্তব্য নাথমলজি কি হাভেলী, নাথমলজিও ছিলেন রাজার দেওয়ান।

মন্ত্রীদের হাভেলি দেখা হলে চললাম রাজার প্রাসাদে। সুন্দর ক্লকটাওয়ার, মিউজিয়ম আর রূপোর সিংহাসনে সাজানো প্রাসাদের এক অংশ হোটেল। যে কেউ টিকিট কাটলেই বসতে পারবেন সিংহাসনে। রাজস্থানে এসে পাঁচ মিনিটের রাজা হতে আপত্তি কিসের?

মরুভূমি, কেল্লা এসব ছাড়াও জয়শলমীরের পুতুল নাচ বিখ্যাত। গাডিসার লেকে সানসেট দেখে ফেরার পথে তা অবশ্য দ্রষ্টব্য। মহারাওয়াল জয়শয়াল ও গাডি সিং এই হ্রদ নির্মান করেন মরুশহরের পিপাসা মেটানোর জন্য। নীল শান্ত সরোবরে বোটিং করতে করতে দিনের শেষ সূর্য তার সোনালি কিরণ হলুদ বেলেপাথরের ছত্রীর ওপর ছড়িয়ে দিয়ে অস্তমিত হল। আমরাও বোটের থেকে নেমে হাঁটতে লাগলাম পুতুল নাচের দিকে। শীতের ছুটিতে মরুশহর জনাকীর্ণ। ভীড় বাঁচিয়ে ফেরার পালা হোটেলে, আবার কালকের সফরের জন্যে তোলা আছে টানোত মাতা আর লঙেওয়ালা বর্ডার।

ভ্রমণ কাহিনী

ডিসেম্বরের শেষের শীত, রাত যেমন ঠাণ্ডা, দিন তেমনই উষ্ণ গরম। তবে দীর্ঘ দিন দিল্লীতে থাকায় ঠাণ্ডায় অত কষ্ট হচ্ছিল না। খুব ভোর ভোর এক কাপ চা-কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম মরু প্রান্তরের উদ্দেশ্যে, যেখানে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে পাহারা দিচ্ছে বি.এস.এফ.। অনতি-দূরেই পাকিস্তান বর্ডার আর মরুতীর্থ হিংলাজ।



চিত্র পরিচয়ঃ গাডিসার লেক...

গাড়ী চলেছে দুপাশে বালিয়াড়ি, ইয়ার্দাঙ আর জ্যুগেনের মধ্য দিয়ে। মরুভূমিতে বায়ু নির্মম ভাবে শিলাকে কর্তিত করে, বিশেষ করে মাঝামাঝি অংশে। তাই চওড়া নীচের অংশ আর চওড়া মাথা নিয়ে সরু গলার শিলসমূহ মাশরুম রকের রূপ ধারণ করেছে। চওড়া গাড়ীর রাস্তা খুব মসৃণ, ঠিক যেন টেক্সাস বা আরিজোনার রাস্তা, মাঝে মাঝে চেক পোষ্ট, আধার কার্ড নিল এক জায়গায়। প্রথমেই গেলাম টানোতমাতা, ইনিও এক ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধ্বী, যাঁকে হিংলাজ মাতার অবতার জ্ঞানে পুজো করা হয়। ড্রাইভার বলতে থাকে তাঁর মহিমা, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান-ভারতের যুদ্ধের সময় অনেক শেল পড়ে, কিন্তু এই মন্দিরে, একটাও ফাটেনি। শুধুমাত্র তাই নয়, ভারতীয় সেনা পায় ঐতিহাসিক জয়।

এসব শুনতে শুনতেই পৌঁছে গেলাম মন্দিরে। বি.এস. এফ. এর তত্ত্বাবধানে ১৯৬৫ থেকেই এ মন্দিরে পুজো চলছে। মন্দিরের বাইরে মায়ের ইতিহাসঃ ৮০৮ সালে জয়শলমীরে মাতা হিংলাজের আশিসধন্যা এই কন্যা মামড়িয়া চারণের ঘরে জন্ম নেন।

টানোত মাতা দর্শনের পর চললাম ভারত-পাকিস্তান বর্ডার দেখতে। এখানে মরুভূমির উগ্ররূপ, ডিসেম্বরেই ত্রিশ ডিগ্রী, না জানি গরমে কি হয়! এতক্ষণ মধ্যযুগের রাজাদের বীরগাথার নিদর্শন দেখেছি, এবার আধুনিক যুগের বীরদের সাথে সাক্ষাৎ হলো। সামরিক মিউজিয়ম ঘুরে চলে এলাম বডাবাগ, যেখানে সোনালি বেলেপাথরের তৈরী ছত্রী মনে করিয়ে দেয় রাওয়ালদের ইতিহাস। মরুভূমির অপর প্রান্তে বায়ুকলগুলি বনবন করে ঘুরছে, অপ্রচলিত উপায়ে তৈরী হচ্ছে বায়ু-বিদ্যুৎ, যা স্বর্ণনগরীকে রাত্রে আলোকিত করবে।

...ক্রমশ ■

পুজোর গন্ধ তখন–এখন

প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় অধ্যায়*

শ্যাম্পুর ধারণাটা আমাদের ছোটবেলায় ছিল না। শ্যাম্পু জিনিসটা হয়ত ছিল – অবশ্যই ছিল তবে সেটা কলকাতায়, আমাদের মত মফঃস্বলে বা গ্রামে নয়। তখন মেয়েরা বলতো মাথা ঘষা। সোডা বা রিঠে ফল দিয়ে মাথা ঘষতো তাতেই চুল ফুলে থাকত। স্কুল জীবনে দেখেছি পাড়ার কিশোরী এবং তার ওপরের বয়সের মেয়েরা দিদিরা অনেকে একসঙ্গে পুকুর ঘাটে চান করতে আসত এবং একে অপরের মাথা ঘষে দিত। আমাদের ছেলেদের ক্ষেত্রে স্কুল জীবন এবং কলেজ জীবনের শুরু পর্যন্ত মাঝে মাঝে মা একদিন ধরে চান করাত। কাপড় কাচার সাবান মাথায় মাখাত এবং যত ধুলো ময়লা বেরিয়ে যেত। যারা ঐ সময়ে ছাত্র তাদের প্রায় সকলেরই এক অভিজ্ঞতা। যেদিন মা চান করাবে, মাথা থেকে গড়িয়ে সাবান জল চোখে পড়বেই, কিন্তু মা ছাড়বে না। অনেক বড় বয়সেও ঐ সময়ে কেঁদে ফেলেছি। চান করে উঠে অবশ্যই নারকেল তেল মাথায় মাখিয়ে দিত। তো মেয়েরা মাথা ঘষত – মানে আমাদের নজরে পড়ত অবশ্যই

নেই সেই...

দু'ট দিন পুজোর সময় এবং সরস্বতী পুজোর দিন। দোলের দিন করত রঙ তোলার জন্য। অন্যান্য দিন তারা আমাদের অত নজরে পড়ত না।

একটা ঘটনা বেশ মনে পড়ছে। কৈশোর পেরিয়েছি, তখন তরুণ বয়স – যৌবনে প্রবেশের দ্বারে। হাবভাবে পৌরুষ প্রকাশের দম্ভ, মনে রোমান্টিকতার উঁকি-ঝুকি। পাড়ার বা অন্যও সমবয়সী মেয়েদের কারোর কারোর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বা আকাঙ্ক্ষা। মুখে প্রকাশের ভয় ও লজ্জা। সে বড় মধুময় অনুভুতি। এমনই এক দুর্গাপূজার অষ্টমীর রাত। অষ্টমী তিথির শেষ আর নবমী তিথির শুরুর সন্ধিক্ষণে হয় সন্ধি পুজো। সেবার সন্ধি পুজো পড়েছিল অনেক রাতে। রাত প্রায় একটা। পুজো প্যাণ্ডেলে লোক কম। মা জেঠিমার বয়সীরা দু'চার জন ফল কাটছেন। পুরুষদের মধ্যে বড়রা প্যাণ্ডেলের পাশের ক্লাবঘরে বসে তাস খেলছেন। অল্প বয়সীদের মধ্যে আমি আর সে।

সে সেদিন মাথা ঘষেছিল, গোটা পিঠে ছড়িয়ে একরাশ ঘন কালো ফলানো চুল। শাড়ি পড়েছে আকাশী রঙের। উবু হয়ে বসে চন্দন ঘষছে, দূর্বা বাচছে। আমি তার সামান্য তফাতে বসে ধুনুচিতে ছোবরা দিয়ে ঠিক করছি। আরতি শুরু হলেই লাগবে। নিতাই কাকা তাস খেলতে খেলতে একবার উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠাকুর মশাই আর কত দেরী?" পুরোহিত মশাই তাঁর আসনে বসে

ছিলেন। ঠাকুরের বেদির কাছে রাখা টাইমপিস ঘড়ি দেখে বললেন, "ঐতো একটা তের মিনিটে শুরু হবে আর মিনিট দশেক।" নিতাই কাকা সব দিক দেখে ঢাকিদের একজনকে বললেন, "ক্লাব ঘর থেকে বলির ফল দুটো নিয়ে এসে রাখ। ঢাকি একটা গোড়া আর পাতা সমেত আখ আর একটা বড় চালকুমড়ো এনে বলির জায়গায় রাখল। তারপর নিতাই কাকা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাঃ তোকে তো খুব সুন্দর লাগছে রে।" সে একটু হাসল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। আবার মুচকি হাসল। আমি বার বার দেখছিলাম। সন্ধি পুজো আরম্ভ হল। রাতের নিঃস্তব্ধতা খান খান করে ঢাক কাঁসর ঘন্টা বেজে উঠল। ঢাকের শব্দে দু'চারজন ঘুম থেকে উঠে এল সন্ধি পুজো দেখতে।

পুরোহিত জোরে জোরে মন্ত্র পড়ছেন। আমি ধুনুচিতে হাওয়া দিয়ে আগুন উস্কে দিচ্ছি। কখন যেন সে ঠিক আমার পাশেই এসে বসেছে। আমি কয়েকবার তার দিকে দেখছি। সমবেত আওয়াজের মধ্যে কেউ শুনতে পেল না সে আমাকে খুব নিচু গলায় বলল, "কি দেখছ অমন করে?" আমি বললাম, "তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।" একটু হেসে লাজুক গলায় সে বলল, "ধ্যাৎ।"

সেদিন সারারাত কাছাকাছি ছিলাম বারবার দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে, হাসির বদলে হাসি। কিন্তু কথা বেশি হয়নি। কেবলই ভয়, কে দেখবে - কে কি ভাববে! পরের দিন নবমী রাতে

নেই সেই...

ঠাকুরমশাই আরতি করেন অনেকক্ষণ ধরে। ঢাকের আওয়াজ, ধুনুচির ধোঁওয়া নাচ... এরই মধ্যে সে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সারাক্ষণ।

দশমীর দিন পাড়ার সব কাকীমা জেঠিমারা মিলে ঠাকুর বরণ করল। সধবা স্ত্রীলোকেরা একে অপরের মাথায় ঠাকুরের ছোঁওয়া সিঁদুর পরিয়ে দিল, আর একটু করে হাতের শাঁখায় ছুঁইয়ে দিল। তখনও সে আমার পাশে। আমি প্রায় ফিসফিস করে বললাম, "একদিন তুমিও এটা করবে।" লজ্জায় লাল হয়ে গেল তার মুখ। তখনকার দিনে ঠাকুর বিসর্জন করতে মেয়েরা যেত না। খুব ছোটরা বাবার সঙ্গে যেত। একটু বড় মেয়েরা কিছুদূর গিয়ে ফিরে আসত। কিন্তু সে সেদিন গেল। সারাটা রাস্তা আমার পাশে পাশে। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে সাতবার ঘুরে ঠাকুরকে জলে ফেলা হল। সবাই প্রণাম করল।

আমি দেখলাম তার চোখে জল। আমায় গোপন করেনি - শুধু বলেছিল, "খুব খারাপ লাগছে।" কেন খারাপ লাগছে, সেটা বলেনি। ওরা আমাদের পাড়ায় ভাড়া থাকত বেশ কয়েক বছর ধরে। সে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে, ওরা অন্য জায়গায় চলে গেল। আবার পুজো এসেছে – ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কলেজ ছেড়ে কর্মজীবনে ঢোকার পালা চলছে। সব কিছু ভুলে না গেলেও, স্মৃতিটা ফিকে হয়ে আসছিল।

নেই সেই...

এমনই এক পুজোর অষ্টমীর দিন, কলকাতায় সারারাত ঠাকুর দেখতে গেছি কলেজের তিন বন্ধুর সঙ্গে। কলেজ স্ট্রীট থেকে তাড়াতাড়ি আমহার্ষ্ট স্ট্রীট যাবার জন্য একটা গলির ভেতর দিয়ে হাঁটছি। রাস্তার ধারেই, একটা ঘরে দরজার সামনে সে বসে – পিঠে এক ঢাল কাল চুল। পাশে একটি চার-পাঁচ বছরের মেয়ে। বন্ধুদের বললাম, “তোরা একটু এগিয়ে যা, আমার পাড়ার মেয়ে, একটু কথা বলে যাচ্ছি।” আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, “তুমি!” সে বলল, “এটা আমার শ্বশুর বাড়ী।” আমাকে জিজ্ঞেস করল, “কেমন আছ?” আমি বললাম, “ভালো।” পাশের মেয়েটির দিকে দেখিয়ে বলল, “এটা আমার মেয়ে।” আমি ওর কপালের দিকে তাকাতেই দেখি, সিঁথিটা যেন হরতালের দিনের রাস্তার মত হাহাকার নিয়ে জেগে আছে। ও আমার মনের কথা বোধহয় অনুমান করতে পেরেছিল। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে নিজেই বলল, “গত বছর অষ্টমীর দিন ওর বাবা মারা যায়।” আমার বুকে যেন হাতুরির ঘা পড়ল...

***(পাঠকদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে – ফেলে আসা বছরগুলোর পুজোর সময়ের কিছু বিছিন্ন ঘটনা দিয়ে সাজিয়ে, লেখক এই ধারাবাহিকটি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। যদিও প্রত্যেকটি ঘটনার সাথে পুজোর সংযোগ রয়েছে, তথাপি একটি ঘটনা বা অধ্যায়ের সাথে পরবর্তী অধ্যায়ের কোন যোগসূত্র নেই।)** ■

একটি সকাল আমার জন্য

দোলা ভট্টাচার্য

রাতের আকাশে জেগে আছে কোজাগরীর চাঁদ,
দুধসাদা জ্যোৎস্নায় চরাচর আজ প্লাবিত।
প্রহরের পর প্রহর হয় অতিক্রান্ত,
আঁখিপাতে ঘুম নেই আজ।
একছাদ জ্যোৎস্নায় ভিজে ওঠে অন্তর,
ভিজে যায় দু'চোখের পাতা।
মন বলে
রাত জাগার সাথী কই সাথে!

বড় সাধ ছিল -
এমনই এক রাতে
দুজনার হাত রেখে হাতে
হারিয়ে যাব কোথাও...

ওই যে,
যেখানে আছে লবটুলিয়ার জঙ্গল।
রাতভর জ্যোৎস্না মাখব গায়ে
জ্যোৎস্না করব পান
হয়তো কখনো, পায়ে পায়ে উঠে যাব

আশা

ফুলডুংরি টিলার ওপরে।
দুচোখ ভরে দেখব
মায়াবী রাতে শহর কেমন ঘুমায়!

পূর্ণ হয়নি সে সাধ আমার।
তাই নির্ঘুম রাত কাটে
চিলেকোঠার ঘরে।
রাত জাগা দুটি চোখ অপেক্ষা করে
অনাবিল আলোয় মাখা
নতুন এক সকালের ॥ ■

পুনরায় সাগর পেরোলে

শরণ্যা মুখোপাধ্যায়

১।।

উৎসর্গঃ একটি সমুদ্রতীরে / একাকী যুধিষ্ঠিরে

সমুদ্র ডাকিলে পুনরায়, পারেতে দাঁড়িও
ছদ্মবেশ ছেড়ে, অকালীন
গোধূলি বিকালে শোনো,
নির্জন কর্ণধারের বৃক্ষ, সাগরের স্রোতে

আলোটুকু জ্বেলে নেওয়া শুধু আলো হতে
অন্ধভাবে, জোনাক-যেমতে।

বিরাটের কূল ভেঙ্গে গেলে
অনামী সে জন, আ-নামা স্বজন
ফের পৌঁছে কুলায়
ছায়াগান, নদীটির প্রতীক্ষায়।

প্রস্তর মাঝারে কীট-খাদ্যাখাদ্য ক'রে বিনিময়
একটি ঈশ্বরের খোঁজে দিন চলে গেলে
অনামী সে জন, অনামী, স্বজন,
দাঁড়হীন, নৌকাহীন, অগ্নিহীন স্পর্শ হয়ে জ্বলে।

হৃদয়ের শব্দ

২।।

তারপর চোখ বুজে আসে
দীর্ঘ পীড়ার এ জোনাকে, আলোক জ্বলে-

শহর পাড়েই থাকে, আমি যাই জলভাঙ্গা ভোরে
মায়াবী নগরে
যার লেশ নাই, রেশ নাই ও শহর জুড়ে।

যার ঢেউ ভাঙ্গে স্রোতানল যেন, যার মুঠো খোলে
অরূপ কাজল,
যার শিশুমুখ আজো জানে বাঁশি,

সেই নগরীর কথা জানে জল, যার ঢেউ জানে
মর্ত চলাচল, তার মরজগতের সীমাভ'র
রচে পুষ্করিণী, মিলনের ডোর

জেনে সাগরের ভূমিকা অঝোর, জেনে
সে জলের নেই হেথা নাম,
জেনে, অশ্রুর দায় আর দাম।

৩।।

প্রাচীন ফুলের ঝাড়
কুটিরটি ঢাকে দেখি, তাই, এই
কুঞ্জের দ্বারেতে দাঁড়াই, যে গানখানি

হৃদয়ের শব্দ

শুনে এই ফুল, তার মুখ দেখিবার অবকাশে
মোর দুই চোখে সুর ভ'রে আসে।

দূরে ওই, সাগর নুপুরে
বাতাসের শেষ ডাক ত'রে

ফুলগুলি ঝ'রে গেলে প'রে
মুখখানি ঝাপসা, অঝোরে... ।।

৪।।

ঝড়ের রাতের নাও, ফের
খুঁজে পেলে, আমিও স্বাধীন।

কেউ ধুলোমুঠি করে, কেউ সোনামুঠি
পান্থরূপ খড়ে একমেটে দুইমেটে...
অভিশাপ, আতান্তর

বিসর্জন শেষে, সাগরবেলার কাঠামোর
আর কি বা দায়
ছাই বা কীটদষ্টতায়...

সাগর শুনেছি নাকি, সকলই ফিরা'য়

কিছু নিলে,
তাকে নাই বিকাবার দায়।

হৃদয়ের শব্দ

৫।।

আমরণ মন্ত্রগুপ্তি ওই মন্দ্র ঢেউ
সবাই রয়েছে, তবু ফিরিলোনা কেউ...

শতপাপ অবধি ধৈর্য্যের সুদর্শন
শঙ্খচক্রে, অতল বিধুর যবনিকা টেনে
পথ মুছে দিলে
প্রাচীন ও বৃদ্ধাটির রোয়াকের
মাছ ধরা জাল দেখি।
রুপালী প্রতীক্ষা জানি,
জটিল প্রস্তুতি চেয়ে।

জাল কেটে গেলে, হব ফেউ
আমরণ মন্ত্রগুপ্তি, ফিরিব না, ... কেউ।।

৬।।

সেইসব উড়ন্ত গাছেরা
ঘরে ফেরে নাই সাঁঝ হলে, যারা
আশ্রবণ মানচিত্র আঁকি
উহাদের, - গভীর অলীক পাখি...
সেইসব উড়ন্ত গাছেরা -
রং তুলি, হাঘর পাখিরা, -

হৃদয়ের শব্দ

-যতবার, আঁকি, সুগন্ধ আসিছে, দেখি।
যার নাম জানি নাই, আজো
কোথা থাক' ফুল, না চন্দন? ওজ'
বা রজ'? সাগর জানিয়াছে
তার ঠিকানা কি? কোন রাত-আলো
নক্ষত্রের, জানে সেই গন্ধবান?

সাগর তবে কি এক ধাঁধা?
কোমল কঠিন জল ঢাকি, দেয় বাধা?

নক্ষত্রের আলো শুধু জানে, ফুটিলে তারকা
সমুদ্র মধ্যের সেই সাগরিকা?

৭।।

সিঁদুর ফুলের মত পড়ে আছি
এই দুয়ারের কাছাকাছি
পুরোন চাঁদের ফলা থেকে দেখা যায়
কালো ঢেউ,
সৈকতে দাঁড়ায়ে কেউ...

অশ্রুহীন অনায়াস
অনাচার অনুকূলে
সিঁদুর রঙ্গের ফুলে,
জল জেগে থাকে।

হৃদয়ের শব্দ

৮।।

কলসীর কানাতে আনিব মধু
যত হোক বেলা, আর ঢেলা।
একক দ্বীপের খোঁজ
এনে দেব নিভৃতের বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর লাগি,

একটি দিনের গান মাগি
চেয়ে রব বাঁশবাগানের পানে
অন্ধকার যার, কেবল জোনাই জানে।
বৃষ্টির মেঘের মত কালো, দেবে জল অবশেষে
এই জেনে, নদী সাগরেতে মেশে।

বিষাদ সন্তাপ মোহনায়
সমুদ্র সমুখে বয়ে যায়।

৯।।

শরমে মরমে চাঁদ বয়ে গেলে
একটি নক্ষত্রে দেখ মুখ
"হাস্যবদন, হে, আমাকে নে"

এই বলে, আমিও জানাই,
স্বরলিপি, যার সুর বলে দেবে জেনে
হে সাগর, তোমার ও তীর নিই মেনে।

হৃদয়ের শব্দ

১০।।

দূরে কেউ যায়, খালি পায়।
গহনে বেদনে, এই বার্তা
গড়ে স্বপ্নসেতু। তবু অন্তরায়
এই বার্তাহীন শুষ্ক বীতরাগ
ভাঁটা।

স্তব্ধশোক, শঙ্কাহীন মাগে
স্বপ্নকামী হরিধ্বনিগুলি ভাসানের আগে,
ঢেউ, যেন জাগে।

১১।।

একটি পথের দুই ধারে যদি
কেবল সাগর থাকে, আর থাকে নদী
কিভাবে বুঝিবে তবে, সাড়ম্বর
পাখিগুলি দিক ক'রে ঠিক,
তোমারই আকাশে, আর
ওই কিনারের গান,
তোমার সেতুর শিলালিপি,
সাগর বেলার অস্তছায়া
তোমার নামেতে জ্বালে বাতি
গন্ধমূলে তোমারই অভিজ্ঞাটি পাতি... ■

ক্ষেপা, ভিখ না, রোজগার কর

সরজিৎ মণ্ডল

একটা বাচ্চা ভিখারি ছেলের বেলুন ফাটানো খেলা দেখে অবাক হলাম। হ্যাঁ, অবাক হওয়ার মতোই ছিল তার খেলা।

বাচ্চাই বলা ভালো। কত আর বয়স হবে? পাঁচ-ছ' বছর। সত্যি বললে বলতে হয়, এই যে ভিখারিটাকে নিয়ে আমি আমার একটা লেখা ফাঁদতে চলেছি, সেই তাকে আমিও অন্য লোকের মতোই কিছু ভিক্ষা না দিয়েই তার দুঃখে কাতর হচ্ছিলাম। এটা কেমন দয়া দেখানো তা আপনারাও বেশ ভালমতোই বুঝতে পারছেন। তাই না?

যা হোক, বেশি হেন-তেন না বকে যে কথা বলতে চলেছি তাই বলি এখন।

রাত ন'টা বাজতে চলেছে। শহর মুম্বাইয়ের এক বাজারে জায়গা। দোকানগুলো থেকে লোকজন ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে।

বাচ্চা ছেলেটা সেটা বেশ বুঝতে পারছে। ভিক্ষা না করে নিজে রোজগার করার ইচ্ছাই যে তার ছিল তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। না হলে বেশবাসে ভিখারি হলেও, তার হাতে বিক্রির জন্য কয়েকটা বেলুন থাকবে কেন?

অনুভব

হ্যাঁ, ছেলেটাকে নিশ্চয় কিছুদিন আগে কেউ বলেছিল, “এভাবে ভিক্ষা না করে রোজগার করতে পারিস না? খেটে খেতে পারিস না?” উপদেশকারী তারপর বলেছিল, “যতসব চোর তোরা। তোদেরকে ভিক্ষা তো দেওয়া উচিতই না বরং মেরে তাড়ানো উচিত। ওঃ! দু’দন্ড যে ভালো বাজার করব তার জো নেই। আমার বাচ্চাটা আজ আপেল খেতে চেয়েছে, তা যে কিনব, তার কি উপায় আছে, এদের জ্বালায়!”

কথাটা এই ছেলেটার মনে নিশ্চয় দাগ কেটেছিল, আর তাই আমাদের দেশে যে ভিখারি নেই – তা প্রমাণ করতে লেগে পড়েছিল সে। সে ঠিক করল, যেমন করেই হোক কয়েকটা টাকা জমা করবে। তারপর তাতে কোন একটা ব্যাবসা করবে। তার এহেন চিন্তা আমাদের মতো অবাধ্য বড়লোকের ছেলেদের মাথায় এলে আমরাও খুশি হতে পারি।

সে যাই হোক, বেচারা ছেলেটাতো প্রথম প্রথম কিছুতেই টাকা জোগাড় করতে পারছিল না। পারবে কি করে? খিদে ভুলে থাকা তো আর সোজা কথা নয়, পেটের জ্বালা... সারাদিনের ভিক্ষে মাত্র কয়েকটা পয়সা। তাতে পুরো দিনে ঠিকমতো নিকৃষ্ট বা মানুষের ফেলে দেওয়া খাবারও একবার পাওয়া যায় না। সুতরাং, পেট টিপে রেখে ভবিষ্যতে ব্যাবসা করার টাকা জমানোর কথা ভাবা যায় কি না জানি না, তবে করা যায় না। তাই হল, কিছুতেই তার টাকা জমা হচ্ছিল না। তবুও সে টাকা জমা করেছিল। তিন টাকা। আর এই

অনুভব

তিন টাকা দিয়ে সে কয়েকটা বেলুন কিনেছিল, এই দোকানপাট এলাকায় ঘুরে ফিরে সমাজের বড়লোক বাচ্চাদের ঐ বেলুন দিয়ে আনন্দ দিয়ে কিছু রোজগার করবে বলে। এই ব্যাবসাটা নিশ্চয় মহৎ। যে আনন্দ সে পাচ্ছে না, তার বয়সের অন্য বাচ্চা তো পাবে? সেই ভেবেই তার এ ব্যাবসা। আর তার পেটও বাঁচবে কয়েকটা টাকা রোজগার করে। অন্ততঃ, তাকে আর ভিক্ষা করতে হবে না। দেশে ভিখারি এভাবেই কমে যাবে বলে সে অনুমান করে ছিল। কিন্তু কী হল তার অনুমানের? সেটা কি সার্থক হল?

তার ব্যাবসা শুরু করতে হলে যে তার পোশাকটা আর ভিখারির মতো থাকা উচিত নয়, তা সে ঠিক বুঝতে পারেনি। আর বুঝলেও, সে পোশাক কেনা যে তার পক্ষে সম্ভব নয়, সেটা সে কেন – অন্য যে কোন বাচ্চাও ভালোভাবেই বুঝতে পারবে। ফলে, তার কাছ থেকে বড়লোকের বাবা-মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের বেলুন কিনে দিতে সাহসই পেল না। বরং ওকে বলতে লাগল, "তোর কী রোগ আছে কে জানে বাবা? সে জটিল রোগ আমাদের ছেলেমেয়েদের গায়ে লেগে যাবে যদি তোর মুখ দিয়ে ফোলানো থুতু মাখানো ও বেলুন আমার ছেলেমেয়েরা হাতে নেয়..."

আমার অবশ্য মনে হচ্ছিল সারাদিন কেবল জল খেয়ে থাকলে মুখ দিয়ে থুতুর ফেনা ছাড়া আর কিবা বের হতে

পারে? নিশ্চয় শক্ত কিছু অমৃত বা মধু নয়। আর, তার চেয়েও বড় ব্যাপার হল, বিনা 'পাম্পারে' মুখ দিয়ে ওর বেলুন ফোলানো অনেকটা নিজের শ্বাসবায়ুর সাথে জীবনকে বাজি রেখে বাইরের দূষিত হাওয়াকে ফুসফুসের জালিতে পরিশুদ্ধ করে সে বেলুনের ভেতর পাঠানো। বেলুনের হাওয়ার প্রচণ্ড চাপকে প্রতিহত করে তার দুঃখের চাপের লড়াইয়ের জয়। কিন্তু সে জয় যে তাকে 'জয়' এনে দেয় না, তা সেই ধনীর দুলালীর বাকি কথাগুলো শুনলেই বোঝা যাবে। "তোদের কাছ থেকে বোকার মতো জিনিস কেনার ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা অত বোকা নই।"

সত্যিই তো, এইসব ছেলেমেয়েরা যাদের জন্মের ঠিক নেই, যারা সারাদিন নোংরা ঘেঁটে খাবার বেছে খায়, তাদের সে খাবারে বা শরীরে যে অন্য কিছু মারণব্যাধির জীবানুরাও ভাগ বসিয়ে আছে তা তো সহজেই অনুমেয়। সুতরাং, বিচক্ষণ মানুষ তা করতে যাবে কেন? স্বাভাবিক। আর তাই আমিও সে জায়গা থেকে নিজেকে দূরে সরালাম না।

আমি দূর থেকে দেখতে লাগলাম। ছেলেটা বেলুন বাঁধা লাঠিটা দু' পায়ের মাঝখানে চেপে, তিন পায়ে দাঁড়ানোর মতো হয়ে এক হাতে পেট চেপে অন্য হাতে পকেট হাতড়াতে লাগল। আর তার পুরো পকেটে জমা দুটো পয়সা দেখে কেমন নিরাশ হয়ে ভেঙে যেতে লাগল! বুঝলাম, তার

অনুভব

আজ এখনো খাওয়া হয়নি, আর সে দুটো পয়সায় যে কোন খাবারই হবে না, তারই ইঙ্গিত তার মুখে ফুটে উঠল।

অনেক রাত হয়ে গেছে। আজ তার বেলুন বিক্রি হওয়ার কোন আশা নেই। কাল বেলুনগুলো থাকলে এমনিতেই সেগুলো থেকে হাওয়া বেরিয়ে চুপসে নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং, সেগুলো ফাটিয়ে কিছু মজা নিয়ে নেওয়াই ভালো। তাতে যদি খিদেটা ভোলা যায়!

ছেলেটা পা দিয়ে সে বেলুনগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে ফাটাতে লাগল। লাথি মারতে লাগল। সে লাথিটা কি আমাদের সমাজকে নয়? কে জানে! ■

দু'টি অণু গল্প – রিয়া মিত্র

রক্তঃ জ্যামে আটকে ড্রাইভিং সিটে বসে অধৈর্য হয়ে উঠল সুচেতা। প্রায় প্রতিটি সিগন্যালে হিজড়াদের উৎপাত। একরাশ ঘৃণা নিয়ে ওদের মুখের ওপর কাচ উঠিয়ে দিল সে। সিগন্যাল খুলতেই হঠাৎ পিছনের গাড়িটা ধাক্কা মারে সুচেতার গাড়িটাকে।

চোখ খুলতেই নার্স জানায়, "প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল। আপনার গ্রুপের যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত আমাদের ব্লাডব্যাঙ্কেও ছিল না। সঠিক সময়ে উনি আপনাকে নিয়ে এসে রক্ত না দিলে বাঁচাতে পারতাম না।"

পাশের বেডের শুয়ে থাকা ব্যক্তিটিকে দেখেই চমকে উঠল সুচেতা। সিগন্যালের সেই হিজড়াটি তখন হালকা হেসে বলছে, "তোর আর আমার ব্লাডগ্রুপ ম্যাচ্ করায় আমিই দিয়ে দিলাম রক্তটা...।" ■

খুনীঃ "নির্মমভাবে একটি সাত বছরের মেয়েকে যে বা যারা খুন করেছে, প্রশাসন তাদেরকে ছেড়ে দেবে না, তাদের উপযুক্ত শাস্তি তারা পাবেই" – মাইকে এলাকার কাউন্সিলর পলাশবাবুর আশ্বাসবাণী ভেসে আসছে তার স্ত্রী সুজাতাদেবীর কানে।

তিন বছরের ছেলেকে খাওয়াতে খাওয়াতে সুজাতাদেবী মনে মনে ভাবলেন, পাঁচ বছর আগে ক্ষমতার জোরে লিঙ্গ-নির্ধারণের পর নিজের কন্যা ভ্রূণ সন্তানের হত্যাকারীর মুখে এ'সব ভাষণ ঠিক মানায় না... ■